বরকতময় দিনগুলো
Islamicalo.com

অনুবাদ ঃ-
আব্দুল হামীদ ফাইযী

الأيام المباركة

(اللغة البنغالية)

إعداد : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة المجمعة

ترجمة : عبد الحميد الفيضي

ভূমিকা

আল-হামদু লিল্লাহি অহদাহ, অস্-স্বালাতু অস্-সালামু আলা মাল লা নাবিয়্যা বা'দাহ। আম্মা বা'দ ঃ-

কল্যাণের মৌসম একটার পর একটা আসতেই থাকে। উচ্চ হতে থাকে হিম্মত-ওয়ালাদের সুউচ্চ হিম্মত। এই তো কিছুদিন আগে রমযান বিদায় নিল। এখন এসে উপস্থিত হল যুলহজ্জ মাসের 'বর্কতময় দিনগুলি'।

প্রিয় পাঠক! প্রত্যেক মুসলিমই দ্বীনের কাজে বড় হিম্মত ও স্পৃহা রাখে। আমাদের এ কাজে হিম্মতের প্রধান খুঁটি আপনিই। আপনার তরঙ্গায়িত তথা নিয়ন্ত্রিত আবেগ-অনুভূতিই আমাদেরকে লিখন ও বক্তৃতার কাজে উদ্বুদ্ধ করে। আপনার আগ্রহ ও আপনার প্রতি আমাদের ভালোবাসা এবং সেই সাথে মহান প্রতিপালকের কাছে প্রতিদানের আশা আপনার হাতে বারবার উপহার তুলে দিতে উৎসাহিত করে।

পবিত্র ও 'বর্কতময় দিনগুলি'র শুভাগমন উপলক্ষ্যে আপনার সুকোমল হাতে এই ক্ষুদ্র অথচ মহান উপহার তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দবোধ করছি।

আশা করি দ্বীনী প্রীতি-ভালোবাসার এই অমূল্য উপহারকে সাদরে

গ্রহণ করে আপনি আপনার আমলের শাহী-মহলে স্থান দেবেন।

আমরা আপনার এই উপহারকে মহান আল্লাহর বাণী দ্বারা অলঙ্কৃত, মহানবী ﷺ-এর হাদীস দ্বারা সুরভিত এবং হকপন্থী উলামাগণের উক্তি দ্বারা সুশোভিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

পূর্বপ্রকাশিত 'যুলহজ্জের তেরো দিন' থেকে এটি কোন পৃথক পুস্তিকা নয়। তবে এতে কিছু বিষয় অতিরিক্ত ও কিছু বিষয় সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। আশা করি যে, আমরা এ কাজে আল্লাহর তওফীক লাভ করেছি।

আল্লাহর কাছেই আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন এ কাজের সংশ্লিষ্ট সকলকে নেক বদলা দান করুন এবং এর দ্বারা পাঠক-পাঠিকাকে উপকৃত করুন। আমীন।

দাওয়াত অফিস, আল-মাজমাআহর পক্ষ থেকে -

আব্দুল হামীদ ফাইযী

২৩/৯/২৭হিঃ

১৫/১০/০৬খৃঃ

সুযোগের সদ্ব্যবহার

জ্ঞানী মানুষরা লাভের যথার্থ সময়ে আত্মনিয়োগ করে, যাতে তাঁরা লাভের একটা বড় অংশ অর্জন করে নিতে পারেন। আমরা সচরাচর দেখতে পাই যে, জাগতিক বিষয়ের বিচক্ষণ এবং লাভের যথার্থ সময় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা দিনরাত পরিশ্রম করে থাকে; অধিক লাভ অর্জনের আশায় আরামের ঘুম বর্জন করে থাকে। অথচ সেই পরিশ্রমে তারা পুঁজির সমপরিমাণ অথবা তার অর্ধেক অথবা তার থেকে কম লাভ পেয়ে থাকে; নচেৎ অনেক সময় লাভ ও পুঁজি উভয়ই হারিয়ে থাকে।

ঐ দেখুন না, পরীক্ষার সময় এলে ছাত্র-ছাত্রীরা তা কিভাবে কাজে লাগায়; কি ঐকান্তিক পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার সাথে তার প্রস্তুতি নিয়ে থাকে তারা।

আমরা লক্ষ্য করি, শীত-গ্রীষ্মের ব্যবসার সিজনকে ব্যবসায়ীরা কিভাবে কাজে লাগায়। ছুটি ও পরবের সময়গুলিতে কিভাবে তাদের ব্যবসার জমজমাট বেচা-কেনার উদ্যোগকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। তারা চায় না যে, তাদের একটা সিজন অথবা সিজনের একটি দিনও হাত ছাড়া হোক।

আপনি লক্ষ্য করবেন, বড় বড় কোম্পানীর মালিকরা কিভাবে টেন্ডার হাতছাড়া না হওয়ার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালায়। ঠিকে নেওয়ার জন্য চুক্তিপত্র পাওয়ার আশায় কত প্রয়াস চালায়। সূক্ষ্মভাবে গভীর ভাবনা-চিন্তা করে রাতদিন কত যোগাযোগ রক্ষা করে, কত সলা-পরামর্শ করে থাকে!

আপনি কি মনে করেন? যদি কোন বস্ত্রব্যবসায়ী ঈদ ও পরবের সময় তার দোকান বন্ধ করে ঘরে বসে থাকে অথবা কোথাও বেড়াতে যায়, কোন বই-খাতার দোকানদার যদি বাৎসরিক ছুটির পর নতুন বছরে স্কুল খোলার সময় তার দোকান বন্ধ রেখে তার দু-তিন সপ্তাহ পরে খুলে, তাহলে আপনি কি মনে করেন যে, তারা অর্থ উপার্জনের জন্য জ্ঞানী ও উপযুক্ত লোক?

এ হল পার্থিব জগতের বাজার, ব্যবসা ও তার লাভ-নোকসানের কথা। সুতরাং আল্লাহর সাথে তার প্রিয় বান্দার ব্যবসা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? রহমানের সাথে ব্যবসার মৌসম এলে, ক্ষমা, দয়া ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এলে সেই ‘বর্কতময় দিনগুলি’কে কিভাবে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করবেন -তা ভেবে-চিন্তে দেখেছেন কি?

বলাই বাহুল্য যে, ঈমানদার মুসলিমের উচিত, সেই মৌসমে যথাসম্ভব বেশী বেশী লাভ অর্জন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। সেই সময় বেশী বেশী নেক আমল ও আল্লাহর ইবাদত করে যাওয়া; যা তাকে তাঁর নৈকট্য এবং সুউচ্চ মর্যাদা দান করবে।

যুলহজ্জের প্রথম দশ দিন
এই দিনগুলির ফযীলত

মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর একটি বড় অনুগ্রহ এই যে, তিনি তাঁর নেক বান্দাদের জন্য বাৎসরিক বিশেষ ইবাদতের মৌসম নির্ধারণ করেছেন। যে মৌসমে বান্দারা অধিক পরিমাণে নেক আমলের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে, তাঁর নৈকট্য দানকারী কর্মে আপোসে প্রতিযোগিতা করতে পারে এবং তাঁর বিশাল পরিমাণ সওয়াব লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে।

তাঁর অনেক অনুগ্রহের মধ্যে এটিও একটি মহা অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণের আয়ু দিয়ে পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখেন; যাতে আমরা পরকালের চিরসুখ লাভের জন্য অধিক পরিমাণে নেক আমল করে নিতে পারি।

যদিও উম্মতে মুহাম্মাদীর আয়ুষ্কাল পূর্ববর্তী অন্যান্য উম্মতের তুলনায় অনেক কম। মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের আয়ু ষাট থেকে সত্তর বছর।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ১০৭৩নং)*

তবুও মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এ উম্মতকে এমন আমল ও তার মৌসম দান করেছেন যার ফলে তাদের বয়স বৃদ্ধি ও বর্কত লাভ করে। অল্প সময়ে সেই আমল করলে এত সওয়াব লাভ হয়, যা বহু বছর ধরে করলে তা লাভ করা সম্ভব হত।

এই ধরনেরই একটি ফযীলতপূর্ণ মৌসম হল যুলহজ্জ মাসের প্রথম দশটি দিন। যে দিনগুলি হল দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। মহানবী

ﷺ বলেন, “দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল (যুলহজ্জের) দশ দিন।” *(বায্যার, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে’ ১১৪৪নং)*

বলাই বাহুল্য যে, ব্যাপকার্থে উক্ত দিনগুলি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন; এগুলির প্রতিটি মিনিট, ঘন্টা, রাত ও দিন আল্লাহর নিকট বছরের অন্যান্য সমস্ত দিনের চাইতে অধিক প্রিয়।

আল্লাহ তাআলা এই দিনগুলির শপথ করেছেন। আর কোন জিনিসের নামে শপথ তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যেরই প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْفَجْرِ {١} وَلَيَالٍ عَشْرٍ {٢}

অর্থাৎ, শপথ ঊষার, শপথ দশ রজনীর----। *(সূরা ফাজর ১-২ আয়াত)*

এই দিনগুলির মধ্যে রয়েছে আরাফাতের দিন। যে দিন সম্বন্ধে মহানবী ﷺ বলেন, “আরাফাতের দিন ছাড়া এমন কোন দিন নেই, যাতে আল্লাহ পাক বান্দাকে অধিক হারে দোযখ থেকে মুক্ত করে থাকেন। তিনি (ঐ দিনে) নিকটবর্তী হন এবং তাদেরকে (হাজীদেরকে) নিয়ে ফিরিশ্তাবর্গের নিকট গর্ব করেন। বলেন, ‘কি চায় ওরা?” *(মুসলিম ১৩৪৮নং)*

এই দিনগুলির শেষে রয়েছে কুরবানীর দিন এবং তার পরে মিনায় অবস্থান করার দিন। যে দুটি দিন সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেন, “আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় (মর্যাদাপূর্ণ) দিন হল কুরবানীর দিন, অতঃপর মিনায় অবস্থানের দিন (যুলহজ্জের ১১ তারীখ)।” *(আবূ দাঊদ, মিশকাত ২/৮১০)*

এই দিনগুলিতে কৃত নেক আমলের মাহাত্ম্য রয়েছে বিশাল।

ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন। "এই দশ দিনের মধ্যে কৃত নেক আমলের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আর কোন আমল নেই।" (সাহাবাগণ) বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে এমন কোন ব্যক্তি (এর আমল) যে নিজের জান-মাল সহ বের হয় এবং তারপর কিছুও সঙ্গে নিয়ে আর ফিরে আসে না।" *(বুখারী, আবূ দাঊদ)*

অথচ এ কথা বিদিত যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হল ঈমানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন আমল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট?' তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি ঈমান।" সে বলল, 'তারপর কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ।" সে বলল, 'তারপর কি?' তিনি বললেন, "গৃহীত হজ্জ।" *(বুখারী ১৬নং)*

তবুও উপর্যুক্ত হাদীসসমূহে এ কথাই প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহর নিকট যুলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল বছরের অন্যান্য দিনের আমল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অধিক প্রিয়।

সুতরাং কি বিশাল এ মাহাত্ম্য! কি সুন্দর এ নেকীর মৌসম! কি সুর্বণ এ সওয়াব অর্জনের সুযোগ!!

অন্যান্য দিনের জিহাদও উক্ত দিনগুলির কোন আমলের চেয়ে উত্তম নয়; অথচ জিহাদ হল আল্লাহর প্রতি ঈমান ও যথাসময়ে নামাযের পর সর্বশ্রেষ্ঠ আমল!

প্রতিযোগী ইবাদতকারীর জন্য কি সুন্দরই না এই মহান মৌসম!

আর অবহেলাকারী উদাসীনের জন্য প্রবঞ্চনা বৈ আর কি?

সুতরাং মন থেকে আলস্য ও অবজ্ঞা দূর করুন এবং আখেরাতের কাজে শীঘ্রতা করুন। মহানবী ﷺ বলেন, "আখেরাতের কাজ ছাড়া প্রত্যেক কাজে ধীরতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।" *(আবূদাঊদ ৪৮১০, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩০০৯নং)*

আখেরাতের কাজে প্রতিযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করে মহান আল্লাহ বলেন,

(وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) (المطففين : ٢٦)

অর্থাৎ, আর তা লাভের জন্যই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। *(সূরা মুত্বাফফিফীন* ২৬ *আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

(فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَات) (البقرة : ١٤٨).

অর্থাৎ, তোমরা কল্যাণের জন্য প্রতিযোগিতা কর। *(সূরা বাক্বারাহ ১৪৮ আয়াত)*

এই জন্যই ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী সাঈদ বিন জুবাইর যুলহজ্জের প্রথম দশক উপস্থিত হলেই (ইবাদতে) এমন পরিশ্রম করতেন যে, তিনি অক্ষম হয়ে পড়তেন। *(দারেমী)* তাঁর নিকট থেকে এ কথাও বর্ণনা করা হয় যে, 'এ দশকের রাতে তোমরা তোমাদের বাতি নিভিয়ে দিও না।'

যুলহজ্জের প্রথম দশ দিন সর্বশ্রেষ্ঠ কেন?

হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, 'এ কথা স্পষ্ট হয় যে, যুলহজ্জের প্রথম দশ দিনের বিশেষ গুরুত্বের কারণ; যেহেতু ঐ দিনগুলিতে মৌলিক ইবাদতসমূহ একত্রিত হয়েছে যেমন, নামায, রোযা, সদ্কাহ এবং হজ্জ। যা অন্যান্য দিনগুলিতে এইভাবে জমা হয় না। *(ফতহুল বারী ২/৪৬০)*

ইবনে কুদামাহ (রঃ) বলেন, যুলহজ্জের প্রথম দশ দিনের সবটাই মাহাত্ম্য ও মর্যাদাপূর্ণ। এ দিনগুলিতে আমলের বহুগুণ সওয়াব পাওয়া যায় এবং তাতে ইবাদতের জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা চালানো মুস্তাহাব। *(মুগনী ৪/৪৪৩)*

পরিশেষে জেনে রাখুন যে, এই বর্কতময় দিনগুলিতে নেক আমলের প্রতি আগ্রহী হওয়া প্রকৃতপক্ষে কল্যাণের প্রতি ধাবমান ও প্রতিযোগিতা এবং হৃদয়ের 'তাক্বওয়া', পরহেযগারী ও সংযমশীলতার দলীলই বটে। মহান আল্লাহ বলেন,

(ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج: ٣٢)

অর্থাৎ, এটাই আল্লাহর বিধান। আর কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ। *(সূরা হাজ্জ ৩২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

(لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ)

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে কখনোও ওগুলির মাংস পৌঁছে না এবং রক্তও না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া (সংযমশীলতা)। *(সূরা হাজ্জ ৩৭ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, মুবারকবাদ তার জন্য, যে নেক আমল ও কল্যাণময় কর্ম দ্বারা এই দশদিনের সদ্ব্যবহার করে।

অতএব আমাদের উচিত, এই দিনগুলিকে নেক আমল ও উত্তম কথা দ্বারা আবাদ করতে আমরা যেন সর্বতোভাবে সচেষ্ট হই। আর যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজ করার দৃঢ় সংকল্প করে, আল্লাহ তাকে সেই কাজে সহযোগিতা করে থাকেন এবং তার জন্য সেই সকল উপায়-উপকরণ সহজ করে দেন যার ফলে সে তার কাজ ভালোরূপে সম্পন্ন করতে পারে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সত্যবাদিতার পরিচয় দেয়, আল্লাহ তার জন্য নিজ ওয়াদা পূর্ণ করেন। আল্লাহর পথে সাধনা করলে তিনি তাঁর পথ সহজ করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

(وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) (العنكبوت: ٦٩)

অর্থাৎ, যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। *(সূরা আনকাবূত ৬৯ আয়াত)*

অলসতা কেন?

সম্ভবতঃ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা যে, সকল মানুষই রমযান মাসের দিবারাত্রির আধ্যাত্মিকতার কথা হৃদয়-মনে অনুভব করে; ফলে আল্লাহর ওয়াস্তে দিনে রোযা রাখে, রাতে তারাবীহ পড়ে, কুরআন তেলাঅত করে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী দান-খয়রাত করে। পক্ষান্তরে বহু মানুষই যুলহজ্জের প্রথম দশকে সেই অনুভূতি রাখে না এবং সেই অনুসারে আমলও করে না। অথচ এই দিনগুলিতে কৃত আমল সারা বছরের যে কোন দিনে কৃত আমল অপেক্ষা আল্লাহর নিকট বেশী পছন্দনীয়।

আমরা মনে করি যে, এই দিনগুলির মাহাত্ম্য সম্পর্কে অজ্ঞতা হল অন্যতম কারণ; যার ফলে আমাদের অনেকেই জানে না যে, এই মৌসম একটি মাদ্রাসা এবং উচিত এই যে, সেখান হতে মুসলিম বিশাল পরিমাণ লভ্যাংশ নিয়ে ফারেগ হবে এবং সেখানে সে প্রভাবান্বিত হবে। অতঃপর সে নিজের জীবনে পরিবর্তন লক্ষ্য করবে; যাতে পাবে হৃদয়ের সংশুদ্ধি এবং কর্মের সঠিকতা।

আমাদের জন্য উচিত যে, আমরা এই মৌসমের প্রত্যেকটি দিনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সুফল লাভের জন্য তা আত্মশুদ্ধি ও আত্ম-সংস্কারের কাজে ব্যবহার করব। যাতে আমরা গত দিনের তুলনায় আজকের দিন এবং আজকের তুলনায় আগামী দিনে বেশী ভালো

হতে পারি। যেহেতু হৃদয়ে জং ধরে; আর সে জন্য প্রয়োজন পালিশের। হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়ে; আর সে জন্য প্রয়োজন শক্তিবর্ধক টনিকের। হৃদয় ভ্রষ্ট হয়; আর সে জন্য প্রয়োজন সরল পথের দিশারীর। হৃদয় ভুল করে ও বিস্মৃত হয়। সে জন্য প্রয়োজন এমন এক বস্তুর যা তাকে সংশোধন করে এবং জীবনের মলিনতা থেকে তাকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করে।

আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই তোমাদের হৃদয়ে ঈমান জীর্ণ হয়; যেমন জীর্ণ হয় পুরনো কাপড়। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা কর, যাতে তিনি তোমাদের হৃদয়ে তোমাদের ঈমান নবায়ন করে দেন।" *(ত্বাবারানী, হাকেম ১/৪৫, সহীহুল জামে' ১৫৯০নং)*

এ জন্যই সুবর্ণ সুযোগ মনে করে এ দিনগুলির সদ্ব্যবহার করা উচিত। যাতে মলিন অন্তর নির্মল হয়, দুর্বল হৃদয় সবল হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে অভিনব চকচকে, হয়ে ওঠে সহিষ্ণু ও কর্মঠ।

পক্ষান্তরে মানুষের হৃদয়-মন হয়ে ওঠে যেমন কবি বলেন,

'মন হল শিশুর মত; যদি তাকে অবহেলা করে ছেড়ে দাও তাহলে অনেক বড় হওয়া পর্যন্ত মায়ের দুধ পান করেই যাবে। আর যদি অল্প দিনে দুধ ছাড়িয়ে দাও, তাহলে সে তা ছেড়ে দিবে। সুতরাং মনের খেয়াল-খুশীকে ব্যাহত কর এবং তাকে তোমার অভিভাবক বানানোর ব্যাপারে সতর্ক হও। যেহেতু যে তাকে অভিভাবক বানায় সে অন্ধ ও বধির হয়ে যায়।'

শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি ঃ যুলহজ্জের প্রথম দশক, নাকি রমযানের শেষ দশক?

এ প্রশ্নের উত্তরে ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, 'যুলহজ্জের প্রথম দশকের দিনগুলি রমযানের শেষ দশকের দিনগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর রমযানের শেষ দশকের রাতগুলি যুলহজ্জের প্রথম দশকের রাতগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' *(মাজমূউ ফাতাওয়া ২৫/২৮৭)*

ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) এই উক্তির টীকায় বলেন, 'এ উত্তর নিয়ে যদি কোন যোগ্য ও জ্ঞানী ব্যক্তি গভীরভাবে চিন্তা করে, তাহলে তা সন্তোষজনক ও যথেষ্টরূপে পাবে। যেহেতু এই দশ দিন ছাড়া অন্য কোন দিন নেই যার মধ্যে কৃত নেক আমল আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় হতে পারে। তাছাড়া এতে রয়েছে আরাফাতের দিন, কুরবানী ও তারবিয়া (৮ই যুলহজ্জে)র দিন। পক্ষান্তরে রমযানের শেষ দশকের রাত্রিগুলি হল জাগরণের রাত্রি; যে রাত্রিগুলিতে রসূল ﷺ জাগরণ করে ইবাদত করতেন। আর তাতে রয়েছে এমন একটি রাত্রি, যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত বিশদ বিবরণ ছাড়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে যাবে, সে সঠিক দলীল পেশ করতে সক্ষম হবে না।' *(যাদুল মাআদ ১/৫৭)*

অবশ্য একটি কথা এখানে জানা জরুরী যে, একটি ভালো জিনিসকে অন্য একটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার মানে এই নয় যে, দ্বিতীয়টির গুরুত্ব কম। বরং এই শ্রেষ্ঠত্বের মানে হল, চেষ্টা ও সামর্থ্য অনুসারে উক্ত ভালো কাজ বেশী বেশী করতে উদ্বুদ্ধ করা।

এই দশ দিনের কর্তব্য

১। রোযা ঃ

রোযা সমষ্টিগতভাবে এক শ্রেণীর নেক কাজ; বরং তা অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেক কাজ। বলা বাহুল্য এ মাসের প্রথম ন' দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব। কেননা মহানবী ﷺ এ দিনগুলিতে নেক আমল করতে উৎসাহিত করেছেন। আর রোযা হল অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল। তাছাড়া মহানবী ﷺ খোদ এ দিনগুলিতে রোযা রাখতেন। তাঁর পত্নী (হযরত হাফসাহ রাঃ) বলেন, "নবী ﷺ যুল হজ্জের নয় দিন, আশুরার দিন এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন; মাসের প্রথম সোমবার এবং দুই বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।" *(সহীহ আবূ দাঊদ ২১২৯নং, নাসাঈ)*

অবশ্য যদি কেউ পূর্ণ নয় দিন রোযা রাখতে অপারগ হয়, তাহলে সে একদিন ছেড়ে পরদিন রাখতে পারে অথবা এর মধ্যে সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে পারে।

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উমার رضي الله عنه এ দিনগুলিতে রোযা রাখতেন। রোযা রাখতেন মুজাহিদ প্রমুখ উলামাগণ। আর অধিকাংশ উলামাগণের মতে এ রোযা শরীয়তসম্মত। *(ইবনে আবী শাইবাহ ৯২২২নং, লাত্বাইফুল মাআরিফ ৪৬১পৃঃ)*

মোট কথা, এ মাসের প্রথম ন' দিনের রোযা মুস্তাহাব। ইমাম নাওয়াবী বলেন, 'ঐ দিনগুলিতে রোযা রাখা পাকা মুস্তাহাব।' *(শারহুন নাওয়াবী ৮/৩২০)*

২। যিক্র ঃ

এই দিনগুলিতে যিক্র করা অন্যান্য দিনের তুলনায় উত্তম। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

(وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) (الحج: ٢٨)

অর্থাৎ, যাতে ওরা নির্দিষ্ট জানা দিনগুলিতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে---। *(সূরা হজ্জ ২৮ আয়াত)*

অধিকাংশ উলামার মতে উক্ত আয়াতে 'নির্দিষ্ট জানা দিনগুলি' বলতে উদ্দেশ্য হল যুলহজ্জের প্রথম দশ দিন। বলা বাহুল্য, এ দশ দিনে আল্লাহর দ্বীনের একটি প্রতীক হল অধিকাধিক তাঁর যিক্র করা; 'আল-হামদু লিল্লাহ' ও 'সুবহানাল্লাহ' পড়া এবং অধিক তাকীদরূপে 'আল্লাহু আকবার' পড়া।

সুতরাং এই মহান দিনগুলিতে বেশী বেশী করে উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা উচিত। পাঠ করা উচিত বর্কতময় দিনগুলির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ে, সকালে-বিকালে, রাত্রে-ভোরে, মসজিদে-বাড়িতে, পথে-গাড়িতে, কর্মস্থলে এবং আল্লাহর যিক্র বৈধ এমন সকল জায়গাতে।

পক্ষান্তরে এই দিনগুলিতে তকবীর পাঠ হবে দুই ধরনের ঃ-

১। সময়-সীমাহীন অনির্দিষ্টভাবে তকবীর পাঠ। যা এ দশকের প্রথম দিনের মাগরেব থেকে তাশরীকের (১১, ১২ ও ১৩ তারীখের) শেষ দিনের মাগরেব পর্যন্ত হাজী-অহাজী সকলের জন্য যে কোন সময়ে সর্বদা পাঠ করা বিধেয়। ইবনে উমার رضي الله عنه এবং আবূ হুরাইরা رضي الله عنه এই দশ দিন বাজারে বের হতেন এবং (উচ্চস্বরে) তকবীর

পড়তেন। আর লোকেরাও তাঁদের তকবীরের সাথে তকবীর পাঠ করত। *(বুখারী, ফাতহুল বারী ২/৫৩১)*

২। সময়-সীমাবদ্ধ তকবীর। আর তা হল প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তকবীর পাঠ করা। এ তকবীর আরাফার দিন ফজরের পর থেকে তাশরীকের শেষ দিন আসর পর্যন্ত পাঠ করা বিধেয়। এ তকবীরের এত গুরুত্ব রয়েছে যে, কিছু উলামা বলেছেন, তা পড়তে ভুলে গেলে কাযা করতে হবে। অর্থাৎ নামাযের পর তা বলতে ভুলে গেলে মনে পড়া মাত্র তা পড়ে নিতে হবে; যদিও তার ওযূ নষ্ট হয়ে যায় অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়। অবশ্য সময় লম্বা হয়ে গেলে সে কথা ভিন্ন।

ইমাম ইবনে বায (রঃ) বলেন, এ থেকে বুঝা যায় যে, সময়-সীমাহীন তকবীর ও সময়-সীমাবদ্ধ তকবীর উভয়ই একত্রে সমবেত হয় আরাফা, কুরবানী ও তাশরীকের তিন দিনে। পক্ষান্তরে ৮ তারীখ ও তার পূর্বের ১ তারীখ পর্যন্ত সকল দিনগুলিতে কেবল সময়-সীমাহীন অনির্দিষ্ট তকবীরই বিধিবদ্ধ। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বায ১৩/১৮)*

তকবীরের ধরন ঃ-

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, অধিকাংশ সাহাবা কর্তৃক যা উদ্ধৃত এবং যা নবী ﷺ থেকে বর্ণিতও করা হয় তার ধরন নিম্নরূপ ঃ-

اَللهُ أَكْبَر، اللهُ أَكْبَر، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَر، اَللهُ أَكْبَر، وَللهِ الْحَمْد.

'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, আল্লাহু আকবার, অলিল্লা-হিল হাম্‌দ।'

'আল্লাহু আকবার' ৩বার বলাও বৈধ। *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৪/২২০)*

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তকবীর এ যুগে প্রত্যাখ্যাত সুন্নতের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রথম দশ দিনে তো অল্প কিছু মানুষ ব্যতীত আর কারো নিকট হতে তকবীর শুনাই যায় না। তাই উচ্চস্বরে তকবীর পড়া উচিত; যাতে সুন্নাহ জীবিত হয় এবং উদাসীনদের মনে সতর্কতা আসে।

৩। উমরাহ ও হজ্জ পালন

এ দশকের সবচেয়ে বড় নেক আমল হল উমরা ও হজ্জ পালন করা। যে এখনো হজ্জ করেনি, তার জন্য কা'বাগৃহের হজ্জ ফরয। এমন ব্যক্তির জন্য হজ্জ পালনে ত্বরা করা উচিত এবং বিনা ওযরে দেরী করলে সে গোনাহগার হবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা হজ্জ পালনে ত্বরা কর। যেহেতু তোমাদের কেউ জানে না যে, তার সম্মুখে কোন্ অসুবিধা এসে উপস্থিত হবে।" *(আহমাদ ১/৩১৪, ইরওয়া ৪/ ১৬৮)*

পক্ষান্তরে যে তার ফরয হজ্জ আদায় করে নিয়েছে এবং এখন সে নফল স্বরূপ তা করতে চায়, তাহলে তা হল এমন এক উত্তম আমল যা আল্লাহর নৈকট্য দান করে।

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি রুকনের অন্যতম। মহানবী ﷺ বলেন, "ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি বিষয়ের উপর; এই সাক্ষ্য দেওয়া যে,

আল্লাহ ছাড়া কেউ (সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রোযা পালন করা এবং সামর্থ্য থাকলে কা'বাগৃহের হজ্জ করা। *(বুখারী ৮, মুসলিম ১৬নং)*

এ রুক্ন সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর তার জীবনে একবার মাত্র ফরয হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً . . . }

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ্ব করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। *(সূরা আলে ইমরান ৯৭ আয়াত)*

কোন মুসলিমের ইসলাম পরিপূর্ণ হতে পারে না; যতক্ষণ না সে উক্ত পাঁচটি রুক্ন পালন করেছে। সঠিক মতে হজ্জ হিজরী সনের নবম সালে ফরয হয়। আর মহানবী ﷺ দশম বছরে বিদায়ী হজ্জ করেন। তিনি নবুঅতের পর ঐ হজ্জ ছাড়া আর অন্য কোন হজ্জ করেননি। যেহেতু তারপরেই মহান আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন এবং হিজরী সনের ১১তম বছরে তিনি সুমহান বন্ধুর সাথে মিলিত হয়েছেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

হজ্জের ফযীলতে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে ইবনে উমারের হাদীস অন্যতম; তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "পবিত্র কা'বার দিকে স্বগৃহ থেকে তোমার বের হওয়াতে, তোমার সওয়ারীর প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ একটি করে সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন এবং একটি করে পাপ মোচন করবেন।

আরাফায় অবস্থান কালে আল্লাহ নিচের আসমানে নেমে আসেন

এবং তাদেরকে (হাজীদেরকে) নিয়ে ফিরিশ্তাবর্গের নিকট গর্ব করেন। বলেন, 'আমার ঐ বান্দাগণ আলুথালু কেশে ধূলামলিন বেশে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে আমার কাছে এসে আমার রহমতের আশা করে এবং আমার আযাবকে ভয় করে, অথচ তারা আমাকে দেখেনি। তাহলে তারা আমাকে দেখলে কি করত? সুতরাং তোমার যদি বালির পাহাড় অথবা পৃথিবীর বয়স অথবা আকাশের বৃষ্টি পরিমাণ গোনাহ থাকে, আল্লাহ তা ধৌত করে দিবেন।

পাথর মারার সওয়াব তোমার জন্য জমা থাকবে।

মাথা নেড়ার করলে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে একটি করে সওয়াব লিখা হবে।

অতঃপর কা'বাগৃহের তওয়াফ করলে তুমি তোমার পাপরাশি থেকে সেই দিনের মত বের হবে, যেদিন তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছিল।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ১৩৬০নং)*

উক্ত হাদীস এবং অন্যান্য হাদীসে রয়েছে সত্বর হজ্জ পালন করার প্রতি আহবান। এতে রয়েছে পাপ থেকে হৃদয়ের পবিত্রতা। বান্দা জানে না যে, এ দুনিয়া ছেড়ে তার বিদায়ের পালা কবে? আর হজ্জ হল গোনাগাঁথা কয়টি দিন। যে ব্যক্তি সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দিল না সে নিশ্চয়ই বঞ্চিত।

মহানবী ﷺ বলেন, "এবং গৃহীত হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়।" *(বুখারী ১৭৭৩, মুসলিম ১৩৪৯নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ করতে যায় ও তাতে কোন প্রকারের যৌনাচার ও পাপাচরণ

করে না, সে ব্যক্তি সেই দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে যেদিন তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল।” *(বুখারী ১৫২১ নং, মুসলিম ১৩৫০ নং)*

নফল হজ্জ করতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য এই প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট। জাবের বিন যায়দ (রঃ) বলেন, ‘আমি সমস্ত নেক আমল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম যে, নামায দেহ ক্ষয় করে; মাল ক্ষয় করে না। রোযাও অনুরূপ। আর হজ্জ দেহ ও মাল উভয় ক্ষয় করে। সুতরাং হজ্জই হল এগুলির মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল। *(হিল্য়্যাহ ৩/৮৭)*

৪। নামাযের প্রতি যত্ন

এটিও একটি সুবৃহৎ ইবাদত। সবচেয়ে বড় ও বেশী ফযীলতপূর্ণ আমল। সর্বদা এই ইবাদতের প্রতি যত্নবান থাকা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। কিন্তু বিশেষ করে এই দিনগুলিতে অধিক যত্নবান হতে নিম্নের নির্দেশমালা গ্রহণ করুন ঃ-

(ক) যথাসময়ে পরিপূর্ণরূপে তার রুকূ ও সিজদা, সুন্নত ও ওয়াজেব আদায় করুন।

(খ) জামাআতের প্রথম কাতারে জায়গা অধিকার করার জন্য আযান শোনামাত্র মসজিদে উপস্থিত হন।

(গ) ফরযের আগে-পরে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ যথানিয়মে আদায় করুন। মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২ রাকআত (সুন্নত) নামায পড়বে, তার জন্য বেহেশ্তে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে---।” *(তিরমিযী, সহীহুল জামে’ ৬৩৬২নং)* অনুরূপভাবে আসরের আগে ৪ এবং মাগরেবের আগে ২ রাকআত পড়তেও আগ্রহী হন।

(ঘ) নফল নামায বেশী বেশী পড়ুন। ষওবান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তুমি আল্লাহর জন্য অধিকাধিক সিজদা করাকে অভ্যাস বানিয়ে নাও; কারণ যখনই তুমি আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তোমাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং তার দরুন একটি গোনাহ মোচন করবেন।" *(মুসলিম ৪৮৮-নং তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

(ঙ) ফরয নামায পড়ার পর তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বের হবেন না। বরং বসে তেলাঅত ও যিক্র করতে থাকুন।

(চ) তাহাজ্জুদের নামায পরিপূর্ণরূপে যথানিয়মে আদায় করুন। আর উত্তম হল মহানবী ﷺ-এর অনুকরণ করে ১১ রাকআত পড়া। তিনি এ নামায নিয়মিত পড়তেন এবং কোন রাতে তা ছুটে গেলে দিনে চাশ্তের সময় কাযা করে নিতেন।

(ছ) ফজরের নামাযের পর সূর্য ওঠা পর্যন্ত মুসাল্লায় বসে যিক্র করুন। অতঃপর দুই রাকআত নামায পড়ুন। এতে আপনি পরিপূর্ণ একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ করবেন। *(সহীহ তিরমিযী ৪৬১নং)*

(জ) চাশ্তের নামায কমসে কম ২ রাকআত পড়ুন।

(ঝ) ফরয নামাযের পর পঠনীয় সব রকমের যিক্র পাঠ করুন।

(ঞ) এক নামাযের পর আগামী নামাযের অপেক্ষা করুন।

৫। কুরআন তেলাঅত

আল্লাহর নৈকট্যদাতা বহু আমলের একটি আমল হল কুরআন তেলাঅত। কতই না উত্তম হয়, যদি আপনি এই দশ দিনের ভিতরে মসজিদে ও ঘরে বসে একবার কুরআন খতম করতে পারেন

এবং কিছু হিফ্‌য করতে পারেন।

৬। আল্লাহর পথে দান করা

নেকীর দরজাসমূহের মধ্যে দান-সদকা করা একটি বড় দরজা। মহান আল্লাহ দানশীলদেরকে বৃহৎ প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন,

(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً)

অর্থাৎ, কে সে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? আল্লাহ তা তার জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৪ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ; যদিও এক টুকরা খেজুর দান করে হোক।" *(বুখারী ১৪১৭, মুসলিম ১০১৬নং)*

এই দশ দিনে অনেক লোকেই টাকা-পয়সার মুখাপেক্ষী থাকে; কারো হজ্জের জন্য প্রস্তুতি নিতে, কারো কুরবানী কিনতে, ঈদের বাজার ইত্যাদি করতে টাকার দরকার হয়ে থাকে। আর দান-খয়রাতের ফলে মানুষের কল্যাণ লাভ হয়, সওয়াব পায় দ্বিগুণ-বহুগুণ, গুপ্তভাবে দানকারীকে মহান আল্লাহ কিয়ামতের মাঠে নিজের ছায়া দান করবেন; যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। দানকারীর জন্য মঙ্গলের দরজা খুলে যায়, বন্ধ হয়ে যায় অমঙ্গলের দরজা। তার জন্য বেহেশ্তের এক দরজা খুলে দেওয়া হয়। আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। মানুষও তাকে ভালবাসে। দানশীল দয়াবান মহানুভব হয়। তার আত্মা ও মাল পবিত্র হয়। অর্থের দাসত্ব থেকে সে মুক্তি পায়। আল্লাহ তাকে তার জান-মাল, পরিবার-

সন্তানের ব্যাপারে ইহ-পরকালে নিরাপত্তা দান করেন।

আমাদের প্রত্যেকেই এ দিনগুলিতে কিছু না কিছু সাদকাহ করতেই পারে। অংশগ্রহণ করতে পারে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মে। আমাদের প্রত্যেকেরই প্রচেষ্টা থাকা উচিত, যাতে এই মঙ্গলময় দিনসমূহে কোন মঙ্গল হাতছাড়া না হয়।

উপর্যুক্ত নেক আমল ছাড়াও উল্লেখযোগ্য আরো অনেক আমল রয়েছে যা এই দিনগুলিতে বিশেষ করে পালন করা কর্তব্য। যেমন, পিতামাতার খিদমত করা, আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করা, সালাম প্রচার করা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা, অসুস্থ রোগীকে দেখা করে সান্ত্বনা দেওয়া, মহানবী ﷺ-এর উপর দরূদ পড়া, ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে ঈদের নামায পড়া ইত্যাদি।

পরিশেষে বলি যে, নেক আমলের কোন সীমাবদ্ধ সংখ্যা নেই। সুতরাং এই বর্কতময় দিনগুলিতে যথাসাধ্য ও সুবিধামত বেশী বেশী নানা ধরনের নেক আমল করুন। এরপর এই দিনগুলির সাথে পরবর্তী দিনগুলিকে সংযুক্ত করুন। যেহেতু মুসলিমের সারা জীবনটাই নেক আমলের বিশাল ময়দান। তবুও কিছু দিনকে বিশেষ ও বেশী মর্যাদা দিয়ে বিশিষ্ট করা হয়েছে, যাতে সে বেশী বেশী আমল করতে উদ্বুদ্ধ হয়। যেহেতু তার আয়ুষ্কাল অতি অল্প এবং নেকী অর্জন ও বদী বর্জন করার প্রয়োজন অতি বেশী। সুতরাং কোমর বেঁধে নেক আমল করে আল্লাহকে দেখান। আল্লাহ আপনাকে নিরাশ করবেন না।

আরাফাতের দিন

আরাফাহ বা আরাফাতের দিন একটি মহানতম দিন। এই দিনটি মুসলিমদের গর্বের ধন। যেহেতু এদিনকার ও এখানকার মত অন্য কোন দিনে ও স্থানে এত বিশাল সংখ্যায় মুসলিমরা সমবেত হয় না। এ হল মুসলিমদের বিশালতম বিশ্ব-সম্মেলন। সারা বিশ্বের ধনী মুসলিমরা এ দিনে এখানে সমবেত হয়। একে-অন্যের সাথে মিলিত হয়ে পরিচিত হয়।

আরাফার দিন মহান প্রতিপালকের কাছে অনুনয়-বিনয় ও কান্না করার দিন; বিশ্ব-জাহানের অধিপতির ভয়ে ভীত হওয়ার দিন। এ দিনে দুআ কবুল হয়ে থাকে। বান্দার গোনাহ-খাত্বা মাফ করা হয়। এই ময়দানে উপস্থিত হাজীদেরকে নিয়ে আল্লাহ ফিরিশ্তাবর্গের নিকট গর্ব করে থাকেন।

এ হল সেই দিন; যে দিনকে আল্লাহ মর্যাদায় মন্ডিত করেছেন। অন্যান্য দিনের তুলনায় এ দিনের মাহাত্ম্য বর্ধন করেছেন। এ দিনে তিনি নিজের মনোনীত দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ ও অনুগ্রহকে পরিপূর্ণ করেছেন। এ দিন ক্ষমার দিন। এ দিন দোযখ থেকে মুক্তির দিন।

কত মহান সে দিন! তার মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। যেমন আমাদের জানা উচিত যে, আমরা এ দিন দ্বারা কিভাবে উপকৃত হতে পারব।

১। এই দিনের ফযীলত

(ক) এই দিন আল্লাহর দ্বীন ও নেয়ামত পরিপূর্ণ হওয়ার দিন।

হযরত উমার বিন খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তাঁকে ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তি বলল, 'হে আমীরুল মুমেনীন! আপনাদের কিতাবের এক আয়াত যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, ঐ আয়াত যদি ইয়াহুদী সম্প্রদায় আমাদের উপর অবতীর্ণ হত, তাহলে (যে দিনে অবতীর্ণ হয়েছে) ঐ দিনটাকে আমরা ঈদ বলে গণ্য করতাম।' তিনি বললেন, 'কোন্ আয়াত?' বলল, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম" (এই আয়াত)। হযরত উমার ﷺ বললেন, 'ঐ দিনটিকে আমরা জেনেছি এবং সেই স্থানটিকেও চিনেছি; যে স্থানে ঐ আয়াত নবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি জুমআর দিন আরাফার ময়দানে দন্ডায়মান ছিলেন। *(বুখারী ৪৫, মুসলিম ৩০১৭নং)*

প্রশ্নকারী ছিল কা'ব আল-আহবার। যেমন তফসীরে ত্বাবারী (৯/৫২৬)তে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, ঐ আয়াত জুমআর দিন এবং আরাফার দিন অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐ দু'টি দিনই আমাদের জন্য ঈদ, আলহামদু লিল্লাহ।

(খ) এ দিন হল মুসলিম (হাজী)দের ঈদ।

মহানবী ﷺ বলেন, "আরাফাহ, কুরবানী ও তাশরীকের দিনসমূহ আহলে ইসলাম, আমাদের ঈদ। আর তা হল পান-ভোজনের দিন।" *(আবু দাঊদ২৪১৯, তিরমিযী ৭৭৩, নাসাঈ ৩০০৪নং)*

আর উমার ﷛ কর্তৃক বর্ণিত করা হয়, তিনি উক্ত জবাবে বলেছিলেন, 'ঐ আয়াত জুমআর দিন এবং আরাফার দিন অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐ দু'টি দিনই আমাদের জন্য ঈদ, আলহামদু লিল্লাহ।'

(গ) আল্লাহ এ দিনের কসম খেয়েছেন।

মহান সত্তা মহা কিছুরই কসম খান। 'মাশহূদ' সেই দিনকে বলা হয়, যেদিন লোকেরা (কোন এক স্থানে) উপস্থিত ও জমায়েত হয়। অনেক তফসীরকারদের মতে তা হল আরাফার দিন। এই দিনের প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ কুরআনে (সূরা বুরূজের ৩নং আয়াতে) তার কসম খেয়েছেন।

আবূ হুরাইরা ﷛ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "(সূরা বুরূজে উল্লেখিত) 'আল-য়্যাউমুল মাউঊদ' হল কিয়ামতের দিন, 'আল-য়্যাউমুল মাশহূদ' হল আরাফার দিন এবং 'আশ্-শাহিদ' হল জুমআর দিন।" *(তিরমিযী ৩৩৩৯নং)*

এই দিনকে বিজোড় দিন বলে উল্লেখ করে তার কসম খেয়েছেন (সূরা ফাজ্রের ৩নং আয়াতে)। ইবনে আব্বাস ﷛ বলেন, 'আশ্-শাফ্উ' হল কুরবানীর দিন এবং 'আল-অত্র' হল আরাফার দিন।

আর এই মত ইকরামা ও যাহ্হাকেরও।

(ঘ) এ হল সেই দিন, যে দিনে মহান স্রষ্টা আদম-সন্তানের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।

ইবনে আব্বাস ﷛ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আরাফায় আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন;

তিনি আদমের পৃষ্ঠ হতে প্রত্যেক সৃষ্ট বংশধরকে বের করে তাঁর সামনে পিঁপড়ের মত ছড়িয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি তাদের সাথে সামনা-সামনি কথা বললেন,

(أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيْنَ، أَوْ تَقُوْلُوْا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ) (الأعراف: ١٧٢-١٧٣)

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, নিশ্চয়ই। আমরা সাক্ষী রইলাম। (এ স্বীকৃতি গ্রহণ) এ জন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এ বিষয়ে জানতাম না। কিংবা তোমরা যেন না বল, আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে অংশী-স্থাপন করেছে আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর, তবে কি মিথ্যাশ্রয়ীদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? *(সূরা আ'রাফ ১৭২-১৭৩ আয়াত, আহমাদ ১/২৭২, হাকেম ২/৫৯৩, মিশকাত ১২১নং)*

সুতরাং কি মহান এই দিন! আর কি মহান সেই অঙ্গীকার!

(ঙ) এ দিন হল পাপরাশি মাফ হওয়ার দিন। দোযখ থেকে মুক্তি লাভের দিন।

(চ) এ দিনে মহান প্রতিপালক আরাফায় অবস্থানরত হাজীদেরকে নিয়ে ফিরিশ্তাদের নিকট গর্ব করেন।

মহানবী ﷺ বলেন, "আরাফাতের দিন ছাড়া এমন কোন দিন নেই, যাতে আল্লাহ পাক বান্দাকে অধিক অধিক দোযখ থেকে মুক্ত

করে থাকেন। তিনি (ঐ দিনে) নিকটবর্তী হন এবং তাদেরকে (হাজীদেরকে) নিয়ে ফিরিশ্তাবর্গের নিকট গর্ব করেন। বলেন, 'কি চায় ওরা?" *(মুসলিম ১৩৪৮নং)*

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ তাআলা আরাফার দিন বিকালে আরাফাত-ওয়ালাদের নিয়ে আসমানবাসী ফিরিশ্তাদের নিকট গর্ব করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, 'আমার বান্দাদেরকে দেখ, আমার নিকট ধূলিমলিন ও আলুথালু রুক্ষ কেশে উপস্থিত হয়েছে!" *(মুসনাদ আহমাদ ২/৩০৫, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমা ৪/২৬৩)*

মুনাবী (রঃ) বলেন, এই গর্ব এই কথার দাবী করে যে, ব্যাপকভাবে আরাফাবাসীর সকল প্রকার পাপ ক্ষমা করা হয়। যেহেতু আল্লাহ সেই হাজীকে নিয়েই গর্ব করেন, যে সর্বপ্রকার পাপ থেকে পবিত্র হতে পেরেছে। পূত-পবিত্র ফিরিশ্তাদের কাছে পাপহীন পবিত্র মানুষ ছাড়া কোন পাপীকে নিয়ে তিনি গর্ব করতে পারেন না। *(ফাইযুল ক্বাদীর ২/৩৫৪)*

২। আরাফার দিন কিছু সলফে সালেহীনের অবস্থা ঃ

কোন কোন সলফের হৃদয়-মনে এ দিন ভয় ও লজ্জা ছেয়ে থাকত।

মুত্বার্রিফ বিন আব্দুল্লাহ ও বাক্র মুযানী আরাফায় অবস্থানকালে তাঁদের একজন বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার কারণে আরাফাবাসীদেরকে (তোমার ক্ষমা থেকে) বঞ্চিত করো না।'

আর দ্বিতীয়জন বললেন, 'কি মাহাত্ম্যপূর্ণ এই অবস্থানক্ষেত্র এবং কত বড় আশার পাত্র সেই মা'বূদ; যদি আমি ওদের মধ্যে না

থাকতাম।'

পক্ষান্তরে তাঁদের কারো কারো মন আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আশায় আশান্বিত থাকত।

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রঃ) বলেন, আরাফার বিকালে আমি সুফয়্যান ষওরীর নিকট এলাম। তখন তিনি হাঁটুর উপর ভর করে বসে ছিলেন এবং তাঁর চোখ দুটি থেকে পানি বইছিল। তিনি আমার দিকে তাকালে আমি তাঁকে বললাম, 'এই সমবেত লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা কার?' উত্তরে তিনি বললেন, 'যে ধারণা করে যে, আল্লাহ তাকে মাফ করবেন না।'

৩। আমরা এই দিন দ্বারা উপকৃত হব কিভাবে?

প্রথমতঃ এই দিনের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হবে। যেহেতু কোন জিনিসের কদর না জানলে আমরা তার যথার্থ কদর করতে পারব না। একজনের প্রকৃত মান জানার পরই তাকে আমরা যথার্থ সম্মান দিয়ে থাকি। তেমনি আরাফার দিনও। আর এ দিন সম্বন্ধে যে ফযীলত, মাহাত্ম্য ও সলফদের অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

এই দিন দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য নিম্নের নির্দেশমালার অনুসরণ করুন ঃ-

হজ্জ করতে আরাফাতে এলে –

(ক) এই দিনকে কাজে লাগাবার জন্য পূর্ণরূপে মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি নিন। এই দিনের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্বন্ধে জানুন।

(খ) এই মহান দিনে আপনি বেশী বেশী তাসবীহ, তাহলীল ও ইস্তিগফার করুন। ইবনে উমার ﷺ বলেন, আমরা আরাফার সকালে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমাদের কেউ তকবীর পড়ছিল এবং কেউ তহলীল পড়ছিল---। *(মুসলিম ১২৮৪নং)*

(গ) তকবীর পড়ুন।

এই দিনের ফজরের নামাযের পর থেকে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত তকবীর পড়া কর্তব্য।

গৃহবাসী হলে অথবা হজ্জ করতে না এলে ঃ-

(ক) এই দিনটির সকল সময়ে ইবাদতে মশগূল থাকুন। অন্যান্য রাতের মত এর রাতে নামায পড়ুন এবং দিনে নানা প্রকার ইবাদত করুন। সাংসারিক কর্ম-ব্যস্ততা অন্য দিনের জন্য পিছিয়ে দিন।

(খ) এ দিনে রোযা রাখুন। যেহেতু মহানবী ﷺ এ দিনের প্রতি অধিক যত্নবান হতে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যের কথা ঘোষণা করেছেন। এ দিনে রোযা রাখার বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন তিনি। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেছিলেন, "এ দিনের রোযা গত ও আগামী বছরের গোনাহ মোচন করে দেয়।" *(মুসলিম ১১৬২নং)*

অবশ্য এ রোযা অহাজীদের জন্য সুন্নত। কোন হজ্জ পালনরত হাজীর জন্য এ রোযা সুন্নত নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ এ দিনে হজ্জ করা অবস্থায় রোযা রাখেননি এবং আরাফায় থেকে আরাফার রোযা রাখতে তিনি নিষেধও করেছেন।

সুতরাং হজ্জ করতে না গেলে আরাফার রোযা রাখার ব্যাপারে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রকাশ করবেন না। যেহেতু এ রোযা হল

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। এর মাধ্যমে আল্লাহ আপনার আগে-পরের দু বছরের গোনাহ-খাত্বা মাফ করে দেবেন এবং আপনার মর্যাদা উন্নীত করবেন।

(ঙ) এই দিনে বেশী বেশী দুআ করুন। এই দিনের শ্রেষ্ঠ দুআ সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেন, "শ্রেষ্ঠ দুআ আরাফার দিনের দুআ; আমি ও আমার পূর্বের নবীগণ যা বলেছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথা,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।'

অর্থঃ- আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই সারা রাজত্ব এবং তাঁরই সকল প্রশংসা। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সর্ব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।" *(তিরমিযী ২৫৮৫নং)*

ইবনে আব্দুল বার্র (রঃ) বলেন, 'উক্ত হাদীস হতে এ কথা বুঝা যায় যে, আরাফার দিনের এই দুআ অন্যান্য দুআ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। যেমন আরাফার দিন অন্যান্য দিনের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। আর এতে এ কথার দলীল বিদ্যমান রয়েছে যে, কোন কোন দিন অপর অন্য দিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। তবে এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা শরীয়তের বিবরণ দানের উপর নির্ভরশীল। আমরা সহীহ সূত্রে যে সকল দিনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য জানতে পেরেছি তা হল, জুমআর দিন, আশূরার দিন ও আরাফার

দিন। অনুরূপভাবে সোম ও বৃহস্পতিবার সম্বন্ধেও বিবরণ এসেছে। বলা বাহুল্য, এ কথা কিয়াস (অনুমিতি) দ্বারা জানার কোন উপায় নেই এবং এতে চিন্তা-গবেষণারও কোন হাত নেই।

উক্ত হাদীস দ্বারা এ কথাও বুঝা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরাফার দিনের দুআ কবুল হয়ে থাকে। আর সব চাইতে শ্রেষ্ঠ যিক্র হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ---।'

আরাফার দিনের দুআর বিশেষ আদব এই যে, হাজী কেবলা মুখে দুই হাত তুলে কাকুতি-মিনতি সহকারে, নিজের ত্রুটির কথা স্বীকার করে এবং সত্য তওবার সাথে দুআ করবে।

পক্ষান্তরে অহাজী মুসলিমও এ মহান দিনে দুআ করতে যত্নবান হবে। মনের ভিতরে এ দিনের গুরুত্বের কথা জাগরিত রেখে, দুআ কবুল হবে এই দৃঢ় আশা রেখে নিজের জন্য, নিজের পিতামাতা ও পরিবার-সন্তানের জন্য এবং ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য দুআ করবে। আর এ দিন রোযা অবস্থায় দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা তো আরো বেশী। কারণ রোযাদারের রোযা রদ্দ হয় না।

হ্যাঁ, আপনার দুআতে যেন সেই মুজাহিদদেরকে ভুলে যাবেন না, যাঁরা জিহাদের ময়দানে শত্রুদের মুকাবিলা করছে এবং যাঁরা দুশমনের নির্যাতনে নির্যাতিত।

দুআ করুন; তবে দুআতে সীমালংঘন করবেন না। দুআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। দুআ করুন নাছোড় বান্দা হয়ে। সেই বান্দার জন্য সুসংবাদ; যে দুআর দিনে দুআ করতে তওফীক লাভ করে।

fl <u>ক্ষমা ও মুক্তি পেতে চান? গোনাহ ছাড়ুন।</u>

সেই কাজ থেকে দূরে থাকুন যা আপনাকে এই দিনে ক্ষমা ও মুক্তি থেকে বঞ্চিত করবে। যে কোন কাবীরা গোনাহ থেকে দূরে থাকুন; দূরে থাকুন অহংকার, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, মিথ্যাবাদিতা, চুগলখোরী ও পরচর্চা (গীবত) থেকে। কোন্ মুখে আপনি ক্ষমার আশা রাখেন অথচ আপনি এখনো পাপ বর্জন করছেন না? কিরূপে আপনি মুক্তির আশা রাখতে পারেন অথচ পাপাচরণের মাধ্যমে আপনি আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করছেন?

পরিশেষে আবারও বলি যে, আরাফার দিন অতীব মাহাত্ম্যপূর্ণ দিন। এ দিন দুআকারীর দুআ কবুল হয় এবং ক্ষমার ভিখারীকে ক্ষমা করা হয়। সুতরাং আমাদের উচিত, এই দিনে বেশী বেশী নেক আমল ও ইবাদত করা। আশা করি, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা ও মুক্তিদানে পুরস্কৃত করবেন। যেহেতু ইবনে রজব বলেন যে, 'এই দিনে দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা সকল মুসলমানদের জন্য ব্যাপক।' *(লাতায়িফ ৩১৫পৃঃ)*

যুবক ও বর্কতময় দিনগুলি

বর্কতময় দিনগুলির যথার্থ কদর করে তার দ্বারা পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়া শরয়ীভাবে বাঞ্ছিত। যে ব্যক্তি এ দিনসমূহের মাহাত্ম্য জানবে তার জন্য উচিত, এগুলিকে সঠিক ইবাদতের কাজে ব্যবহার করা।

কিন্তু এ দিনগুলিতে ছুটি থাকলে বিশেষ করে যুবকদের অনেকেই তার কদর করতে পারে না। হেলায় হারিয়ে যায় তার এমন অমূল্য ধনগুলি। কেউ বা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা-

সাক্ষাতে ও কথাবার্তায় সময় নষ্ট করে, কেউ বা কুটুমবাড়ি অথবা বেড়ানোর জায়গায় বেড়াতে গিয়ে বিরাট সওয়াব অনায়াসে হাতছাড়া করে ফেলে। পক্ষান্তরে যারা এই বর্কতময় দিনগুলিকে পাপকাজে ব্যয় করে এবং অবৈধ সফরে নষ্ট করে তারা যে উভয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তা বলাই বাহুল্য।

মহিলা ও বর্কতময় দিনগুলি

মা-বোনেদের জন্য উচিত, এ দিনগুলি আসার পূর্বে পূর্ণরূপে প্রস্তুতি নেওয়া। আর তার জন্য উচিত নিম্নের নির্দেশাবলীর অনুসরণ করা ঃ-

১। এ দিনগুলির মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদেরকে অবহিত ও সচেতন করা। যাতে তারা এ দিনগুলিতে নিহিত বিশাল সওয়াবের কথা মনের ভিতর অনুভব করে এবং তা উপস্থিত হলে তার যথার্থ কদর করে।

২। এই দিনগুলিতে ইবাদত করার জন্য সাংসারিক কাজ থেকে যথাসম্ভব অবসর গ্রহণ করুন। বিশেষ করে মাহাত্ম্যপূর্ণ আরাফার দিন রোযা সহ অন্যান্য ইবাদতের জন্য অজরুরী কাজকে অন্য দিনের জন্য পিছিয়ে দিন।

৩। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী মহিলাকে প্রেরিতব্য ঈদী উপহার প্রস্তুত রাখুন। যাতে থাকবে দ্বীনী কোন পুস্তিকা অথবা ক্যাসেট, দুআ ও ঈদী মুবারকবাদ।

৪। এ দিনগুলিতে যে মহিলার মাসিক থাকে সে নামায-রোযা রাখা থেকে বঞ্চিত হলেও অন্যান্য ইবাদত থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা

উচিত নয়। যেমন ঃ-

কুরআন তেলাঅত। তবে কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়। বরং কোন কভার দ্বারা ধরে তা পড়তে পারে; আর মুখস্থ পড়তে তো পারেই।

যিক্র; তসবীহ, তকবীর, তহলীল পড়া, ইস্তিগফার ও দুআ করা এবং নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পড়া।

দান-খয়রাত করা, ইফতারীর নাশ্তা প্রস্তুত করা ও ইফতার করানো। ইত্যাদি। *(দেখুন ঃ রমযান স্বাগতম)*

মহিলা ও কুরবানী

১। মহিলার নিজস্ব অর্থ থাকলে নিজের তরফ থেকে নিজে কুরবানী করা উত্তম। সেই সাথে সে যাকে ইচ্ছা তাকে সওয়াবে শরীক করতেও পারে। অতএব সামর্থ্য থাকতে এই সওয়াবের কাজ যেন মহিলার হাতছাড়া না হয় এবং স্বামী অথবা আব্বা করছে বলে সেটাকেই যথেষ্ট মনে করা উচিত নয়।

২। নিজের তরফ থেকে কুরবানী দিলে মহিলাও নিজের নখ, লোম, মরা চামড়া ইত্যাদি কাটবে না। অবশ্য তার তরফ থেকে (আব্বা, স্বামী অথবা ছেলে) কেউ কুরবানী দিলে ঐ নিষেধের আওতায় সে পড়বে না। যেহেতু এ নিষেধাজ্ঞা কেবল তার জন্য যে নিজে কুরবানী দিবে।

৩। মহিলা নিজের কুরবানী নিজের হাতে যবেহ করতে পারে। বরং অনেক উলামাই মনে করেন যে, মহিলার নিজের কুরবানী নিজের হাতেই যবেহ করা উত্তম।

মহিলা ও বকরা-ঈদ

কুরবানীর ঈদে মহিলার যা করা উচিত, তা নিম্নরূপ ঃ-

১। পর্দার ব্যবস্থা থাকলে মুসলিমদের জামাআতে নামায পড়ার জন্য ঈদগাহে বের হয়ে যান। সেখানে খুতবা শুনুন ও তাদের দুআয় শামিল হন। অবশ্য এই সময় নিম্নের আদব খেয়াল রাখুন ঃ-

(ক) পরিপূর্ণ শরয়ী পর্দার সাথে (মুখ ঢেকে) ঘর থেকে বের হন।

(খ) বের হওয়ার আগে কোন রকমের সেন্ট্ ব্যবহার করবেন না।

(গ) ঈদগাহে যাওয়া-আসার সময় পুরুষের ভিড়ে প্রবেশ করবেন না। বরং পৃথক বা দূর রাস্তায় যাওয়া-আসা করুন।

(ঘ) ঈদগাহের ভিতরে বোরকা খুলে নামায পড়লে জেনে রাখুন যে, পাতলা বা নেটের চাদর গায়ে-মাথায় দিয়ে ভিতরের চামড়া বুঝা গেলে অথবা শাড়ি পরে পেট-পিঠ বা হাতের নলি বের হয়ে পড়লে নামায হবে না। (স্বালাতে মুবাশ্‌শির পড়ুন।)

২। ঈদের আসা-যাওয়া ও দেখা-সাক্ষাতের মজলিসে গীবত ও চুগলি থেকে দূরে থাকুন।

৩। ঈদের নানান খাবার প্রস্তুত করতে গিয়ে যথা সময়ে নামায ছুটে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

৪। সাজগোজ ও পানাহারে অপচয় করবেন না।

৫। আপনার কিশোরী ও যুবতী মেয়েদেরকে অবৈধ পুরুষদের চোখের সামনে কোন প্রকার খেলা, প্রদর্শনী বা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দিবেন না।

কুরবানী

'উয্‌হিয়্যাহ' কুরবানীর দিনসমূহে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ-যোগ্য উঁট, গরু, ছাগল বা ভেঁড়াকে বলা হয়। উক্ত শব্দটি 'যুহা' শব্দ থেকে গৃহীত যার অর্থ পূর্বাহ্ন। যেহেতু কুরবানী যবেহ করার উত্তম বা আফযল সময় হল ১০ই যুল্‌হজ্জের (ঈদের দিনের) পূর্বাহ্নকাল। তাই ঐ সামঞ্জস্যের জন্য তাকে 'উয্‌হিয়্যাহ' বলা হয়েছে। যাকে 'য্বাহিয়্যাহ' বা 'আয্‌হাহ'ও বলা হয়। আর 'আয্‌হাহ' এর বহুবচন 'আয্‌হা'। যার সাথে সম্পর্ক জুড়ে ঈদের নাম হয়েছে 'ঈদুল আয্‌হা'। বলা বাহুল্য, ঈদুয্‌যোহা কথাটি ঠিক নয়।

আর কুরবানী শব্দটির উৎপত্তি 'কুর্ব' ধাতু থেকে। যার অর্থ নৈকট্য। কুরবান হল, প্রত্যেক সেই বস্তু, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। আর সেখান থেকেই ফারসী, উর্দু ও বাংলাতে গৃহীত হয়েছে 'কুরবানী' শব্দটি।

কুরবানী করা কিতাব, সুন্নাহ ও সর্ববাদিসম্মতিক্রমে বিধেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)

'অতএব তুমি নামায পড় তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে এবং কুরবানী কর।' *(সূরা কাওষার ২ আয়াত)*

এই আয়াত শরীফে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ﷺ-কে নামায ও কুরবানী এই দু'টি ইবাদতকে একত্রিত করে পালন করতে আদেশ

করেছেন। যে দু'টি বৃহত্তম আনুগত্যের অন্যতম এবং মহোত্তম সামীপ্যদানকারী ইবাদত। আল্লাহর রসূল ﷺ সে আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। তাই তিনি ছিলেন অধিক নামায কায়েমকারী ও অধিক কুরবানীদাতা। ইবনে উমার رضي الله عنه বলেন, "নবী ﷺ দশ বছর মদীনায় অবস্থানকালে কুরবানী করেছেন।" *(মুসনাদ আহমাদ, তিরমিযী)*

হযরত আনাস رضي الله عنه বলেন, 'রসূল ﷺ দীর্ঘ (ও সুন্দর) দু' শিংবিশিষ্ট সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন।' *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি কোন বছর কুরবানী ত্যাগ করতেন না। *(যাদুল মাআদ ২/৩১৭)* যেমন তিনি তাঁর কর্ম দ্বারা কুরবানী করতে উম্মতকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তেমনি তিনি তাঁর উক্তি দ্বারাও উদ্বুদ্ধ ও তাকীদ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের পূর্বে যবেহ করে সে নিজের জন্য যবেহ করে। আর যে নামাযের পরে যবেহ করে তার কুরবানী সিদ্ধ হয় এবং সে মুসলমানদের তরীকার অনুসারী হয়।" *(বুখারী ৫২২৬নং)*

তিনি আরো বলেন, "সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানী করে না সে যেন অবশ্যই আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।" *(মুসনাদ আহমাদ ২/৩২১, ইবনে মাজাহ ২/১০৪৪, হাকেম ২/৩৮৯)*

সকল মুসলিমগণ কুরবানী বিধেয় হওয়ার ব্যাপারে একমত। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। *(মুগনী ১৩/৩৬০, ফাতহুল বারী ১০/৩)*

তবে কুরবানী করা ওয়াজেব না সুন্নত -এ নিয়ে মতান্তর আছে।

আর দুই মতেরই দলীল প্রায় সমানভাবে বলিষ্ঠ। যাতে কোন একটার প্রতি পক্ষপাতিত্ব সহজ নয়। যার জন্য কিছু সংস্কারক ও চিন্তাবিদ্ ওলামা কুরবানী ওয়াজেব হওয়ার পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) অন্যতম। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবা, তাবেয়ীন এবং ফকীহগণের মতে কুরবানী সুন্নাতে মুআক্কাদাহ (তাকীদপ্রাপ্ত সুন্নত)। অবশ্য মুসলিমের জন্য মধ্যপন্থা এই যে, সামর্থ্য থাকতে কুরবানী ত্যাগ না করাই উচিত। [১] উচিত নিজের ও পরিবার-পরিজনের তরফ থেকে কুরবানী করা। যাতে আল্লাহর আদেশ পালনে এবং মহানবী ﷺ-এর অনুকরণে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হতে পারে।

বস্তুতঃ কুরবানীতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদতের খাতে অর্থব্যয় (ও স্বার্থত্যাগ) হয়। যাতে তওহীদবাদীদের ইমাম হযরত ইবরাহীম عليه السلام-এর সুন্নাহ জীবিত হয়। ইসলামের একটি প্রতীকের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পরিবার ও দরিদ্রজনের উপর খরচ করা হয় এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য হাদিয়া ও উপঢৌকন পেশ করা হয়। এত কিছুর মাধ্যমে মুসলিম ঈদের খুশীর স্বাদ গ্রহণ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করতে পেরেই মুসলিম আনন্দলাভ করতে পারে। সেই খুশীই তার আসল খুশী। রমযানের সারা দিন রোযা শেষে ইফতারের সময় তার খুশী হয়। পূর্ণ এক মাস রোযা করে সেই বিরাট আনুগত্যের মাধ্যমে

---

(১) *অপরের দান বা সহযোগিতা নিয়ে হজ্জ বা কুরবানী করলে তা পালন হয়ে যাবে এবং দাতা ও কর্তা উভয়েই সওয়াবের অধিকারী হবে। ঋণ করে কুরবানী দেওয়া জরুরী নয়।*

ঈদের দিনে তারই আনন্দ অনুভব করে থাকে। এই খুশীই তার যথার্থ খুশী। বাকী অন্যান্য পার্থিব সুখ-বিলাসের খুশী খুশী নয়। বরং তা সর্বনাশের কদমবুসী। আল্লাহ পাক কিছু জাহান্নামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলবেন, "এ এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা আনন্দ করতে ও দম্ভ প্রকাশ করতে।" *(সূরা মু'মিন ৭৫আয়াত)*

কারূনের পার্থিব উৎফুল্লতা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, "স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, (দর্পময়) আনন্দ করো না। অবশ্যই আল্লাহ (দর্পময়) আনন্দকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" *(সূরা ক্বাসাস ৭৬ আয়াত)*

অতঃপর জ্ঞাতব্য যে, যেমন হজ্জ না করে তার খরচ সদকাহ করলে ফরয আদায় হয় না, তেমনি কুরবানী না করে তার মূল্য সদকাহ করে অভীষ্ট সুন্নত আদায় হয় না। যেহেতু যবেহ হল আল্লাহর তা'যীম-সম্বলিত একটি ইবাদত এবং তাঁর দ্বীনের এক নিদর্শন ও প্রতীক। আর মূল্য সদকাহ করলে তা বাতিল হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে কুরবানী নবী ﷺ-এর সুন্নাহ এবং সমগ্র মুসলিম জাতির এক আমল। আর কোথাও কথিত নেই যে, তাঁদের কেউ কুরবানীর পরিবর্তে তার মূল্য সদকাহ করেছেন। আবার যদি তা উত্তম হত, তাহলে তাঁরা নিশ্চয় তার ব্যতিক্রম করতেন না। *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৬/৩০৪)*

কুরবানীর আহকাম

কুরবানী করা আল্লাহর এক ইবাদত। আর কিতাব ও সুন্নায় এ কথা প্রমাণিত যে, কোন আমল নেক, সালেহ বা ভালো হয় না, কিংবা গৃহীত ও নৈকট্যদানকারী হয় না; যতক্ষণ না তাতে দু'টি শর্ত পূরণ হয়েছে;

প্রথমতঃ- ইখলাস। অর্থাৎ, তা যেন খাঁটিভাবে আল্লাহরই উদ্দেশ্যে হয়।

দ্বিতীয়তঃ- তা যেন আল্লাহ ও তদীয় রসূলের নির্দেশিত বিধি-বিধান অনুযায়ী হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

(فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً)

অর্থাৎ, যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। *(সূরা কাহফ ১১০ আয়াত)*

সুতরাং যারা কেবল বেশী করে গোশ্ত্ খাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানী দেয় অথবা লোক সমাজে নাম কুড়াবার উদ্দেশ্যে মোটা-তাজা অতিরিক্ত মূল্যের পশু ক্রয় করে অথবা অনেক পশু ক্রয় করে এবং তা প্রদর্শন ও প্রচার করে থাকে, তাদের কুরবানী যে ইবাদত নয় - তা বলাই বাহুল্য।

শায়খ আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রঃ) বলেন, কুরবানীর উদ্দেশ্য কেবল যবেহই নয়। আল্লাহর কাছে তার গোশ্ত পৌঁছে না এবং তার

রক্তও না; যেহেতু তিনি অমুখাপেক্ষী প্রশংসিত। তাঁর নিকট পৌঁছে থাকে কুরবানী দাতার ইখলাস, সওয়াবের নিয়ত এবং সৎ উদ্দেশ্য। এ জন্যই তিনি বলেছেন,

{لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ }

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে কখনোও ওগুলির মাংস পৌঁছে না এবং রক্তও না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া (সংযমশীলতা)। *(সূরা হাজ্জ ৩৭ আয়াত)*

সুতরাং মহান আল্লাহ এর দ্বারা আমাদেরকে কুরবানীতে ইখলাস ও হৃদয়-বিশুদ্ধতার প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেছেন। অর্থাৎ, কুরবানী দেওয়ার পিছনে আমাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্য যেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়। তাতে যেন কোন প্রকার গর্বপ্রদর্শন বা সুনাম অর্জন উদ্দেশ্য না থাকে। যেমন অভ্যাসগতভাবে (লোকের দেখাদেখি গোশ্ত্ খাওয়ার উদ্দেশ্যে) যেন তা না হয়। অনুরূপ সকল ইবাদতই; যদি তাতে ইখলাস ও তাক্বওয়া না থাকে, তাহলে তা হয় সেই ছালবিশিষ্ট ফলের মত যার ভিতরে শাঁস থাকে না এবং সেই দেহের মত যার মধ্যে জান থাকে না। *(তাফসীর সা'দী দ্রঃ)*

বলাই বাহুল্য যে, কুরবানীদাতার উচিত, হৃদয় বিশুদ্ধ করে লোকপ্রদর্শন থেকে দূরে থেকে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা। যেহেতু তিনি বলেছেন,

(قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ)

অর্থাৎ, বল, অবশ্যই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার

জীবন, আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই। *(সূরা আনআম ১৬২ আয়াত)*

আরো উচিত এই কথা মনে রাখা যে, কুরবানী যবেহর মাধ্যমে সে মহান আল্লাহর দ্বীনের একটি প্রতীক প্রতিষ্ঠা করছে। অতএব তার প্রতি তার মনে তা'যীম ও শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ বলেন,

(ذٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مَنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ)

অর্থাৎ, এটিই আল্লাহর বিধান এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সম্মান করলে এতো তার হৃদয়ের তাকওয়া (ধর্মনিষ্ঠা) প্রসূত। *(সূরা হজ্জ ৩২ আয়াত)*

"ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!"

কুরবানীর শর্তাবলী

কুরবানী শুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে; যে শর্ত পূরণ না হলে কুরবানী শুদ্ধ হবে না। যেমন ঃ-

১। কুরবানীর পশু যেন হালাল চতুষ্পদ জন্তু হয়।

২। শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বয়সের পশু যেন হয়। অর্থাৎ,

(ক) উঁটের বয়স যেন কমপক্ষে ৫ বছর হয়।

(খ) গরুর বয়স যেন কমপক্ষে ২ বছর হয়।

(গ) ছাগলের বয়স যেন কমপক্ষে ১ বছর হয়। এবং

(ঘ) ভেঁড়ার বয়স যেন কমপক্ষে ৬ মাস হয়।

৩। কুরবানীর পশু যেন নিম্নোক্ত ত্রুটিমুক্ত হয়।

(ক) এক চোখে স্পষ্ট অন্ধত্ব। (খ) স্পষ্ট ব্যাধি। (গ) স্পষ্ট খঞ্জতা।

(ঘ) অন্তিম বার্ধক্য। এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "চার রকমের পশু কুরবানী বৈধ বা সিদ্ধ হবে না; (এক চক্ষে) স্পষ্ট অন্ধত্বে অন্ধ, স্পষ্ট রোগা, স্পষ্ট খঞ্জতায় খঞ্জ এবং দুরারোগ্য ভগ্নপদ।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

সুতরাং অনুরূপ অথবা তার থেকে বেশী কোন ত্রুটিযুক্ত পশুর কুরবানী যথেষ্ট নয়। যেমন পূর্ণ অন্ধ অথবা চার পা-ই কাটা পশুর কুরবানী শুদ্ধ নয়।

৪। কুরবানীর পশু যেন নিজের বৈধ মালিকানাভুক্ত হয় অথবা তাতে মালিকের অনুমতি থাকে।

সুতরাং অসদুপায়ে অর্জিত পশু ও চুরি করা পশু দ্বারা কুরবানী শুদ্ধ নয়। যেমন শরীকানাভুক্ত পশুর কুরবানী শরীকের অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়।

৫। পশুতে যেন অন্য কারো অধিকার না থাকে; যেমন বন্ধকে নেওয়া পশু অথবা ভাগ-বন্টনের পূর্বে মীরাসের পশুর কুরবানী শুদ্ধ নয়।

৬। কুরবানীর পশু যেন শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে যবেহ করা হয়। সুতরাং সে সময়ের আগে বা পরে যবেহ করলে কুরবানী গণ্য হবে না। *(মুগনী ৮/৭৩৭)*

fl একাধিক কুরবানী

সদকাহ স্বরূপ অধিক কুরবানী দেওয়া উত্তম। যেমন রসূল ﷺ হজ্জের কুরবানীতে ১০০টি উঁট যবেহ করেছিলেন। *(মুসলিম ১২১৮নং)*

fl উৎকৃষ্ট কুরবানী কোন্‌টি?

শ্রেণী অনুপাতে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কুরবানী হল গোটা উঁট, অতঃপর গোটা গরু, তারপর মেষ (ভেঁড়া), তারপর ছাগল। তারপর সাতভাগের একভাগ উঁট। তারপর সাতভাগের এক ভাগ গরু।

এর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পশু হল সেইটি, যার মধ্যে সকল দিক থেকে পরিপূর্ণতার বৈশিষ্ট্য বর্তমান। সুতরাং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভেঁড়া হল, দুই শিংবিশিষ্ট, নর, মোটাতাজা, সাদা রঙের; তবে তার চোখের চারিপাশে ও পায়ে কালো লোম হবে। যেহেতু এই বিবরণের ভেঁড়াই রসূল ﷺ পছন্দ ও কুরবানী করেছেন। *(মুসলিম ১৯৬৭, আবূ দাঊদ ২৭৯২নং)*

একটি মোটাতাজা ছাগল দুটি দুর্বল ছাগল অপেক্ষা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, বেশী সংখ্যক পশু অপেক্ষা বেশী মূল্যবান পশুর কুরবানী আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

ইয়াহয়া বিন সাঈদ (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আবূ উমামাহ বিন সাহ্‌ল ؓ বলেছেন, আমরা মদীনায় কুরবানীর পশুকে মোটা করতাম এবং মুসলমানরা সবাই তা মোটা করত। *(বুখারী, ফাত্‌হ ১০/ ১২)*

ইবনে কুদামাহ (রঃ) বলেন, কুরবানীর পশু মোটা ও সুন্দর করা সুন্নত। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

(وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مَنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ)

অর্থাৎ, এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সম্মান করলে এতো তার হৃদয়ের তাকওয়া (ধর্মনিষ্ঠা) প্রসূত। *(সূরা হজ্জ্‌ ৩২ আয়াত)*

ইবনে আব্বাস বলেন, 'কুরবানী পশুর সম্মান করার অর্থ হল, পুষ্ট মাংসল, সুন্দর ও বড় পশু নির্বাচন করা।' যেহেতু তাতে সওয়াব বেশী এবং উপকারও বেশী। *(মুগনী ১৩/৩৬৭, জামেউল বায়ান ২৭/ ১৫৬)*

fl যে পশুর কুরবানী মকরূহ

১। লেজ কাটা, কান কাটা, কান চিরা, দৈর্ঘ্যে চিরা, পশ্চাৎ থেকে চিরা, সম্মুখ থেকে প্রস্থে চিরা, কান ফাটা ইত্যাদি।

২। পাছা কাটা, স্তন পূর্ণ বা আংশিক কাটা; যেমন স্তনের বোঁটা কাটা।

৩। পাগল পশু; যে চারণভূমিও চিনতে পারে না।

৪। দাঁত ভাঙ্গা।

৫। শিংহীন বা শিং ভাঙ্গা।

বলাই বাহুল্য যে, কুরবানীর পশু ক্রয় করার সময় তাতে কোন ত্রুটি আছে কি না, তা ভালোভাবে যাচাই করে নিন। বয়স জেনে নিন। এমন যেন না হয় যে, তার দ্বারা কুরবানী শুদ্ধ হবে না। আপনার পশু যত ভালো গুণসম্পন্ন হবে, কুবানীর জন্য তা তত উত্তম হবে, আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় হবে এবং আপনার সওয়াবও বেশী হবে। আর তা হবে আপনার তাকওয়ারই পরিচায়ক।

fl কুরবানীর পশু নির্দিষ্টীকরণ

কুরবানীর পশু ঘরের হলে অথবা ক্রয় করলে তা কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে। কথা দ্বারা (মুখে বলে) কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করবে এবং কুরবানীর দিন তাকে কুরবানীর নিয়তে যবেহ করবে।

নির্দিষ্ট করার পর যদি তার কোন ত্রুটি দেখা দেয়, তাহলে ঐ ত্রুটি বড় না হলে (যাতে কুরবানী মকরূহ হলেও সিদ্ধ হবে। যেমন, কান কাটা, শিং ভাঙ্গা ইত্যাদি) তাই কুরবানী করবে। কিন্তু ত্রুটি বড় হলে (যাতে কুরবানী সিদ্ধ হয় না, যেমন স্পষ্ট খঞ্জতা ইত্যাদি) যদি তা নিজ কর্মদোষে হয়, তাহলে তার পরিবর্তে ত্রুটিহীন পশু কুরবানী

করা জরুরী হবে। আর ঐ ত্রুটিযুক্ত পশুটি তার অধিকারভুক্ত হবে। তবে ঐ ত্রুটি যদি কুরবানীদাতার কর্মদোষে বা অবহেলায় না হয়, তাহলে ওটাই কুরবানী করা তার জন্য সিদ্ধ হবে।

fl কুরবানীদাতার আনুষঙ্গিক কর্তব্য

যে ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের তরফ থেকে অথবা জীবিত-মৃত কারো তরফ থেকে দানস্বরূপ কুরবানী করার ইচ্ছা বা সংকল্প করেছে তার জন্য ওয়াজেব; যুলহজ্জ মাস প্রবেশের সাথে সাথে কুরাবানীর পশু যবেহ না করা পর্যন্ত সে যেন তার দেহের কোন লোম বা চুল, নখ ও চর্মাদি না কাটে। এ বিষয়ে প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যখন তোমরা যুলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং তোমাদের মধ্যে কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করবে তখন সে যেন কুরবানী না করা পর্যন্ত তার চুল ও নখ (কাটা) হতে বিরত থাকে।” অন্য এক বর্ণনায় বলেন, “সে যেন তার (মরা বা ফাটা) চর্মাদির কিছুও স্পর্শ না করে।” *(মুসলিম ১৯৭৭নং)*

১। যুলহজ্জের চাঁদ উঠেছে বলে প্রমাণ হলে অথবা যুলক্বা’দার ৩০ দিন পূর্ণ হলেই উক্ত নিষেধ কার্যকর হবে।

২। বলিষ্ঠ মতানুসারে এখানে এ নিষেধ মৌলিক অর্থে হারাম বুঝাতে ব্যবহার হয়েছে। কারণ, তা অনির্দিষ্ট নিষেধ, যার কোন প্রত্যাহতকারীও নেই। *(তফসীর আযওয়াউল বায়ান ৫/৬৪০, আল-মুমতে ৭/৫২৯)*

৩। এমন কোন ব্যক্তি যার চাঁদ দেখার পর কুরবানী করার ইচ্ছা ছিল না, সে চুল বা নখ কেটে থাকলে এবং তারপর কুরবানী করার ইচ্ছা হলে তারপর থেকেই আর তা কাটবে না। নিয়তের আগে যা

কেটে ফেলেছে, তাতে সে গোনাহগার হবে না। অলিল্লাহিল হাম্‌দ।

৪। যদি কেউ জেনে-শুনে ইচ্ছা করেই চুল-নখ কাটে তবে তার জন্য জরুরী যে, সে যেন আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে এবং তার জন্য কোন কাফ্‌ফারা নেই। সে স্বাভাবিকভাবে কুরবানীই করবে। পক্ষান্তরে কেউ ভুলে কেটে ফেললে তা ধর্তব্য নয়।

৫। চুল তোলা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে মাথা ধোওয়া অবৈধ নয়। নারী-পুরুষ সকলেই গোসল করতে পারে এবং অনিচ্ছাকৃত চুল উঠে গেলে কোন ক্ষতি হবে না।

৬। কুরবানী যবেহ করার পর (অহাজীর জন্য) মাথা নেড়া করা বিধেয় নয়।

৭। প্রয়োজনে (যেমন নখ ফেটে বা ভেঙ্গে ঝুলতে থাকলে বা মাথায় জখমের উপর চুল থাকলে এবং ক্ষতির আশঙ্কা হলে) কেটে ফেলতে কোন দোষ নেই। কারণ, সে মুহরিম (যে হজ্জ বা ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছে তার) অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যার জন্য অসুবিধার ক্ষেত্রে মাথা মুন্ডন করাও বৈধ করা হয়েছে।

৮। যে ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের তরফ থেকে অথবা জীবিত-মৃত কারো তরফ থেকে দানস্বরূপ কুরবানী করার ইচ্ছা বা সংকল্প করেছে কেবল সেই এ নিষেধের আয়তায় পড়ে। পক্ষান্তরে যে স্ত্রী-সন্তানের তরফ থেকে কুরবানী করা হবে তারা এ নিষেধের আওতায় পড়ে না। অর্থাৎ, তাদের জন্য নখ-চুল ইত্যাদি কাটা হারাম নয়।

৯। যেমন প্রতিনিধি (যে নায়েব হয়ে অপরের কুরবানী করে দেয় সে) বা অসী (যাকে কুরবানী করতে অসিয়ত করা হয়েছে সে)ও এ

নিষেধের আওতাভুক্ত নয়। তারা নিজের হাতে কুরবানী যবেহ করলেও কুরবানী যেহেতু তাদের নিজস্ব নয়, সেহেতু তারা নখ-চুল ইত্যাদি কাটতে পারে।

১০। যে ব্যক্তি কুরবানীর নিয়ত করার পর হজ্জ অথবা উমরা করবে, সে ইহরাম বাঁধার সময় নখ-চুল ইত্যাদি কাটবে না। অবশ্য হজ্জ বা উমরার শেষে চুল কাটা বা নেড়া করা ওয়াজেব। আর এটি ঐ নিষেধ আওতার বাইরে।

এই নিষেধের পশ্চাতে যুক্তি এই যে, কুরবানীদাতা কিছু আমলে মুহরিমের মতই। যেমন, কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যলাভ করা ইত্যাদি। তাই কুরবানীদাতাও মুহরিমের পালনীয় কিঞ্চিৎ কর্তব্য পালন করতে আদিষ্ট হয়েছে।

fl কেবল মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে কুরবানী

মূলতঃ কুরবানী যথাসময়ে জীবিত ব্যক্তির তরফ থেকেই প্রার্থনীয়। অবশ্য সে ইচ্ছা করলে তার সওয়াবে জীবিত অথবা মৃত আত্মীয়-স্বজনকেও শরীক করতে পারে। যেহেতু নবী ﷺ তাঁর সাহাবাবৃন্দ رضي الله عنهم নিজেদের এবং পরিবার-পরিজনদের তরফ থেকে কুরবানী করতেন।

মৃতব্যক্তির তরফ থেকে পৃথক কুরবানী করার কোন দলীল নেই; তবে করা যায়। যেহেতু কুরবানী করা এক প্রকার সদকাহ। আর মৃতের তরফ থেকে সদকাহ করা সিদ্ধ; যা যথাপ্রমাণিত এবং মৃতব্যক্তি তার দ্বারা উপকৃতও হবে - ইনশাআল্লাহ। পরন্তু মৃতব্যক্তি এই শ্রেণীর পুণ্যকর্মের মুখাপেক্ষীও থাকে।

যবেহর বিধি-বিধান

ইসলামী শরীয়তে হালাল পশুর মাংস হালাল করার জন্য নানা বিধি-বিধান রয়েছে; এখানে বিশেষ করে কুরবানী যবেহর বিধান উল্লেখিত হল।

১। কুরবানী যবেহর সময় ঈদের দিন ঈদের নামাযের পর থেকে শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৩ই যুলহজ্জের সূর্য ডোবার আগে। ঈদের নামাযের আগে যবেহ করলে, কুরবানী শুদ্ধ হবে না।

২। ঈদের নামায দেরী করে পড়া হলে অথবা আগে আগে পড়া হলে অথবা নামাযই না পড়া হলে; দেখার বিষয় হল নামাযের সময়। অর্থাৎ নামাযের যথাসময় পার হয়ে গেলে কুরবানী যবেহ করা যাবে; তাতে তা শহরে হোক অথবা পাড়া-গ্রামে, কুরবানীদাতা গৃহবাসী হোক অথবা মুসাফির।

৩। দিনে-রাতে যে কোন সময় যবেহ বৈধ। তবে রাতের তুলনায় দিনে যবেহ করাই উত্তম। অনুরূপভাবে পরবর্তী দিনের তুলনায় আগের দিনে (অর্থাৎ, ১১র তুলনায় ১০, ১২র তুলনায় ১১, এবং ১৩র তুলনায় ১২ তারীখে) কুরবানী যবেহ করা উত্তম।

৪। কুরবানী পশু হারিয়ে গেলে অথবা চুরি হয়ে গেলে - যদি তা কুরবানীদাতার অবহেলার কারণে না হয়, তাহলে সে দায়িত্বমুক্ত থাকবে। অবশ্য তা ফিরে পেলে যখন তা পাবে তখনই যবেহ করবে; যদিও কুরবানীর সময় পার হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি তা নিজের অবহেলা ও ত্রুটির কারণে হয়, তাহলে তার পরিবর্তে অন্য পশু কুরবানী করা জরুরী।

fl যবেহর নিয়মাবলী

১। সর্বপ্রথম ভালোরূপে ছুরি ধার (শান) দিয়ে নিন।

২। পশুকে বাম কাতে কেবলা মুখে শয়ন করান। অবশ্য অন্য মুখে শয়ন করালেও বৈধ। যেহেতু কেবলা মুখে শয়ন করানো ওয়াজেব বা জরুরী হওয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ দলীল নেই।

৩। ডান হাতে ছুরি ধরুন এবং বাম হাত দিয়ে পশুর মাথা চেপে ধরুন। অনুরূপভাবে কাবু করার জন্য তার গর্দানে পা রেখেও চেপে ধরতে পারেন।

৪। ছুরি চালানোর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলুন। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

{فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ }

অর্থাৎ, যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনসমূহের বিশ্বাসী হও তবে যাতে (যে পশুর যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে তা আহার কর। *(সূরা আনআম ১১৮ আয়াত)*

{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ }

অর্থাৎ, যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা হতে তোমরা আহার করো না; তা অবশ্যই পাপ। *(ঐ ১২১ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "যা রক্ত বহায় এবং যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তা ভক্ষণ কর।" *(বুখারী ২৩৫৬, মুসলিম ১৯৬৮-নং)*

'বিসমিল্লাহ'র সাথে 'আল্লাহু আকবার' যুক্ত করা মুস্তাহাব।

অবশ্য এর সঙ্গে কবুল করার দুআ ছাড়া অন্য কিছু অতিরিক্ত করা বিধেয় নয়।

অতএব (কুরবানী কেবল নিজের তরফ থেকে হলে) বলুন, ‘বিসমিল্লাহি অল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা মিন্‌কা অলাক, আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী।’

নিজের এবং পরিবারের তরফ থেকে হলে বলুন, ‘---তাক্বাব্বাল মিন্নী অমিন আহলে বাইতী।’ অপরের নামে হলে বলুন, ‘---তাক্বাব্বাল মিন (এখানে যার তরফ থেকে কুরবানী তার নাম নিন)। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ৩৬পৃঃ)*

এই সময় নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করা বিধেয় নয়; বরং তা বিদআত। *(আল-মুমতে ৭/৪৯২)* যেমন ‘বিসমিল্লাহ’র সাথে ‘আর-রাহমানির রাহীম’ যোগ করাও সুন্নত নয়। যেহেতু এ সম্বন্ধে কোন দলীল নেই। যেমন যবেহ করার লম্বা দুআ ‘ইন্নী অজ্‌জাহ্‌তু’ এর হাদীস যয়ীফ। *(যয়ীফ আবূ দাউদ ৫৯৭নং)*

৫। যবেহতে খুন বহা জরুরী। আর তা দুই শাহরগ (কণ্ঠনালীর দুই পাশে দু’টি মোটা আকারের শিরা) কাটলে অধিকরূপে সম্ভব হয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যা খুন বহায়, যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তা ভক্ষণ কর। তবে যেন (যবেহ করার অস্ত্র) দাঁত বা নখ না হয়।” *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি, সহীহুল জামে’ ৫৫৬৫নং)*

সুতরাং রক্ত প্রবাহিত ও শুদ্ধ যবেহ হওয়ার জন্য চারটি অঙ্গ কাটা জরুরী; শ্বাসনালী, খাদ্যনালী এবং পার্শ্বস্থ দুই মোটা শিরা।

fl কুরবানীর পশুর প্রতি অনুগ্রহ

পশুকে যবেহ করলেও তার প্রতি দয়া প্রদর্শনের সাথে যবেহ করা আমাদের শরীয়তের নির্দেশ। মহানবী ﷺ বলেন, “অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর অনুগ্রহ লিপিবদ্ধ (জরুরী) করেছেন। সুতরাং যখন (জিহাদ বা হদ্দে) হত্যা কর তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে হত্যা কর এবং যখন যবেহ কর তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে যবেহ কর। তোমাদের উচিত, ছুরিকে ধারালো করা এবং যবেহর পশুকে আরাম দেওয়া।” *(মুসলিম ১৯৫৫নং)*

পক্ষান্তরে তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলী গ্রহণ করুন ঃ-

১। পশুর চোখের সামনেই ছুরিতে ধার (শান) দিবেন না।

২। একটি পশুর চোখের সামনে অন্যকে যবেহ করবেন না।

৩। কঠোরতার সাথে টেনে-হেঁচড়ে পশুকে যবেহর স্থানে নিয়ে যাবেন না।

৪। প্রাণ ত্যাগ করার পূর্বে পশুর অন্য কোন অঙ্গ কেটে কষ্ট দেওয়া হারাম। যেমন ঘাড় মটকানো, পায়ের শিরা কাটা, চামড়া ছাড়ানো ইত্যাদি জান যাওয়ার আগে বৈধ নয়।

fl কুরবানী যবেহর আনুষঙ্গিক মাসায়েল

১। যে যবেহ করতে জানে ও পারে, তার নিজের কুরবানী নিজ হাতে যবেহ করাই উত্তম। যেহেতু যবেহ করা আল্লাহর নৈকট্যদাতা এক ইবাদত। অতএব তা নিজে করাই আফযল।

২। তবে এ কাজে অপরকে নায়েব করা যায় বা অপরের দ্বারা

যবেহ করানো যায়। যেহেতু রসূল ﷺ ৬৩টি উঁট নিজ হাতে নহর করেছেন এবং বাকী উঁট নহর করার জন্য আলী ؓ-কে নায়েব বানিয়েছেন।

৩। উত্তম হল কুরবানীর পশু ঈদগাহে যবেহ করা। ইবনে উমার বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ ঈদগাহে যবেহ ও নহর করতেন। *(বুখারী ৯৮২, নাসাঈ ৪৩৬৬নং)*

৪। কুরবানীর পশু উঁট হলে তাকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তার সামনের বাম পা বেঁধে নহর করতে হয়। উঁট ছাড়া অন্যান্য পশু শুইয়ে গর্দানে পা রেখে যবেহ করতে হয়। যেহেতু এতেই আছে তাদের প্রতি দয়ার বহিঃপ্রকাশ।

৫। যবেহর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে 'বিসমিল্লাহ' বলা জরুরী। বলার পর যবেহ করতে দেরী হয়ে গেলে পুনরায় তা বলতে হবে। অনুরূপভাবে একটি পশুর জন্য তা বলার পর অন্য একটি যবেহ করতে হলে পুনরায় তা বলতে হবে।

৬। কুরবানীর কোন অংশ বিক্রয় করা বৈধ নয়। না তার গোশ্ত, না তার চর্বি বা চামড়া। যেহেতু তা আল্লাহর ওয়াস্তে দান করা মাল; যে নিয়মে ভক্ষণ, বন্টন ও সদকাহ করতে নির্দেশ এসেছে, তা পালন করা মুসলিমের কর্তব্য।

৭। কসাইকে তার মজুরী স্বরূপ কুরবানীর গোশ্ত্ দেওয়া যাবে না। অবশ্য মজুরী অন্য কিছু দিয়ে যদি কিছু গোশ্ত্ উপহার বা দান স্বরূপ তাকে দেওয়া হয়, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই।

fl কুরবানীর গোশ্ত্ বন্টনের পদ্ধতি

কুরবানীর গোশ্ত্ নিজে খান, আত্মীয়-স্বজনকে উপহার দিন এবং গরীব-মিসকীনদেরকে দান করুন। সলফদের অনেকে এই গোশ্তকে তিনভাগে ভাগ করে একভাগ নিজে খেতেন, একভাগ উপহার দিতেন এবং অপর একভাগ দান করতেন।

অবশ্য এ ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

fl কতিপয় জরুরী সতর্কতা

* শহর-বাজারে অথবা প্রবাসে যাঁরা কসাই ভাড়া করে কুরবানী যবেহ করান, তাঁদেরকে সতর্কতার সাথে তা নির্বাচন করা প্রয়োজন। কারণ, হয়তো বা সে এমন লোক হতে পারে, যার হাতে যবেহ হালাল নয়।

* কুরবানীর কোন কিছুই নষ্ট ও অপচয় করবেন না। যা খাবার খান এবং যা দান করার তা দান করুন।

* কিছু লোক কুরবানীর রক্ত নিয়ে কোন মঙ্গলের নিয়তে দেওয়ালে লাগায়, কেউ বা পায়ে লাগায়। এতে কিন্তু শির্ক হতে পারে।

* কিছু লোক আছে, যারা তাদের জীবনের শেষ অবস্থায় নিজের ছেলেদেরকে কিছু সম্পদ নির্দিষ্ট করে প্রত্যেক বছর কুরবানী করার অসিয়ত করে যায়। পক্ষান্তরে তারা তুলনামূলক অধিক গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য খরচের কথা ভুলে যায়। যেমন দ্বীনের দাওয়াতের খাতে, নিঃস্ব মানুষদের অভাব লাঘব করার খাতে এবং জিহাদ ইত্যাদির খাতে ব্যয় করাকে তারা প্রাধান্য দেয় না; ভাবে, কুরবানী করাই

উত্তম। অথচ এ ধারণা ভুল।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল অহ্হাবকে জিজ্ঞাসা করা হল, মৃতব্যক্তির তরফ থেকে দান করা উত্তম, নাকি কুরবানী করা? উত্তরে তিনি বললেন, 'মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে কুরবানী করার চেয়ে দান করাকেই আমি উত্তম মনে করি।' *(আদ্-দুরারুস সানিয়্যাহ ৩/৪১০)*

কুরবানী ও আপনার সুস্বাস্থ্য

কুরবানী ও গোশ্তের মৌসমে সাধারণভাবে হাজী-অহাজী সকলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ উপহার দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

ঈদের এই মৌসমে কিছু লোক আছে যারা অতিরিক্ত পান-ভোজনে স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করে এবং নিজেদের স্বাস্থ্যে ক্ষতি ডেকে আনে। তারা গোশ্ত খাওয়াতে অতিরঞ্জন প্রদর্শন করে এবং তার ফলে তাদের পরিপাকযন্ত্রে নানা সমস্যা দেখা দেয়; বিশেষ করে অধিক চর্বি জাতীয় গোশ্ত্ খাওয়ার ফলে যে ক্ষতি হয় তা থেকে সাবধান হওয়া সচেতন মানুষের কর্তব্য।

আমরা সকলেই গোশ্তের উপকারিতা সম্বন্ধে জানি যে, গোশ্ত্ প্রোটিনের মূল উৎস। গোশ্ত্ প্রোটিনের জন্য অতি মূল্যবান খাদ্য। যেমন গোশ্ত্ উচ্চ পর্যায়ের গুণসম্পন্ন খাদ্যদ্রব্য। যেহেতু তাতে আছে কিছু প্রয়োজনীয় ধাতু এবং ভিটামিন বি। গোশ্তে আছে সর্বপ্রকার মূল এ্যামিনো এ্যাসিডসমূহ।

আমরা পরিমিত পরিমাণে মাংস ভক্ষণ করলে উপরোক্ত

পদার্থসমূহের উপকারিতা গ্রহণ করতে পারি। যেহেতু তা বেশী পরিমাণ ভক্ষণ করলে রক্তে কোলেষ্টেরল ও সুসিক্ত তৈল বৃদ্ধি পেতে পারে; বৃদ্ধি পেতে পারে ইউরিক এ্যাসিড। পক্ষান্তরে শরীরে লবণের মাত্রা নিচে নেমে যায়; বিশেষ করে গেঁটেবাত ও কিডনির রোগীর জন্য।

অনুরূপভাবে যাদের দেহে প্রোটিন চূর্ণ করে তার ফর্মাটিভ ইউনিটে পরিণত করার ক্ষমতা কম আছে, তাদেরকেও অল্প পরিমাণে গোশ্ত্ খাওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়। যেহেতু অধিক পরিমাণে গোশ্ত্ খাওয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন-কণা ধমনীতে বিশোষিত হয়ে এ্যালার্জি সৃষ্টি করে।

পক্ষান্তরে গোশ্ত্ যেহেতু সত্বর পচনশীল খাদ্যদ্রব্য, সেহেতু তার ব্যবহার নিতান্ত সতর্কতার সাথে হওয়া উচিত; কারণ পচা গোশ্ত রোগজীবাণু (কীটাণু) সৃষ্টির একটি অনুকূল পরিবেশ।

সুতরাং প্রত্যেক কসাই ও কুরবানীদাতার উচিত, যবেহর নির্দিষ্ট জায়গাতে যবেহ করা, পাকানোর সময় পূর্ণ পরিচ্ছন্নতার খেয়াল রাখা এবং ভালোরূপে গোশ্ত্ সিদ্ধ হয়েছে কি না তা দেখে নেওয়া।

ঈদের আহকাম

ঈদ খুশী ও আনন্দের মৌসম। মুমিনদের এ দুনিয়ায় খুশী হল একমাত্র মাওলাকে রাজী করেই। যখন মুমিন নিজ মাওলার কোন আনুগত্য পরিপূর্ণ করে এবং তার উপর তাঁর দেওয়া সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করে তখনই খুশীর ঢল নেমে আসে তার হৃদয়-মনে।

যেহেতু সে বিশ্বাস ও ভরসা রাখে সেই আনুগত্যের উপর তাঁর মাওলার অনুগ্রহ ও ক্ষমার প্রতিশ্রুতির উপর। মহান আল্লাহ বলেন,

((قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِه فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ))

অর্থাৎ, তুমি বল, আল্লাহর এই অনুগ্রহ ও করুণা নিয়েই তাদেরকে খুশী হওয়া উচিত। আর তারা যা পূঞ্জীভূত করে তা (দুনিয়া) অপেক্ষা এটি শ্রেয়। *(সূরা ইউনুস ৫৮ আয়াত)*

fl ঈদের মুবারকবাদ

মুবারকবাদ আপোসের মিলন ও সম্প্রীতির আধার, পরস্পরের মাঝে দয়া ও প্রেম সৃষ্টির অন্যতম উপাদান। মুবারকবাদ বিনিময়ের ফলে সমাজে মিলন সংসাধন হয়, বিচ্ছিন্নতা দূরীভূত হয়, বিদ্বেষ বিলীন হয় এবং মনোমালিন্য নিশ্চিহ্ন হয়। মুবারকবাদ হল এক প্রকার 'ভালো কথা'। যার ফল অতি সুন্দর, যার প্রভাব অতি প্রতিক্রিয়াশীল। 'ভালো কথা'র গুরুত্ব এত বেশী যে, কিছু উলামা বলেন, যদি তা ওয়াজেব বলা হয়, তাহলে অত্যুক্তি হবে না। যেহেতু তা বর্জন করলে ফিতনা ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। পক্ষান্তরে মুসলিমরা আপোসে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি প্রকাশ করতে আদিষ্ট হয়েছে। আর মহানবী ﷺ বলেন, "ভালো কথা সদকাহ স্বরূপ।" *(বুখারী ২৮২৭, মুসলিম ১০০৯নং)*

প্রকাশ থাকে যে, অমুসলিমদের সাথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রকাশ করার জন্য ঈদ ও পূজার সময় অনেক মুশরিকভাবাপন্ন পরিবেশে মুবারকবাদ বিনিময় ও মূর্তিপূজায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বহু

অজ্ঞ মানুষ শির্কের সমর্থন করে আনন্দ উপভোগ করে নিজেদের ঈমান নষ্ট করে থাকে। অথচ এ সম্প্রীতি বজায় ও প্রকাশ করতে তা করা জরুরী ও বৈধ নয়। জরুরী হল, মিলেমিশে বসবাস করা এবং শির্ক থেকে শতক্রোশ দূরে থাকা। শির্কে অংশগ্রহণ করে ঈমান বরবাদ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আনয়ন করায় লাভ কি? লাভ হল, ঈমান বজায় রাখার সাথে সাথে অমুসলিমদের পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করা।

বহু মুসলিম শিক্ষিত মানুষ এ কাজ করলেও তাদের কর্মে ধোকা খাবেন না, কারণ তারা দুনিয়াবী শিক্ষিত; দ্বীনী শিক্ষিত নয়।

।ঈদের মুবারকবাদের শরয়ী মান

ঈদ উপলক্ষ্যে একে অপরকে মুবারকবাদ জানানো বৈধ কাজ। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, ঈদের দিন নামাযের পর একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হলে 'তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না অমিনক্' অথবা 'আআ'দাহুল্লাহু আলাইনা' ইত্যাদি বলে মুবারকবাদ বিনিময় করার বৈধতা কিছু সাহাবা কর্তৃক বর্ণিত আছে; তাঁরা তা করতেন। আহমাদ প্রমুখ ইমামগণ এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং যে তা করবে, তার আদর্শ বর্তমান এবং যে তা করবে না, তার আদর্শও বর্তমান। *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৪/২৫৩)*

আল্লামা ইবনে উষাইমীন (রঃ) বলেন, ঈদ উপলক্ষ্যে মুবারকবাদ বিনিময় করা বৈধ। অবশ্য তার জন্য কোন নির্দিষ্ট বাক্য নেই। বরং প্রচলিতভাবে মুবারকবাদের যে সকল বাক্য লোকমুখে প্রসিদ্ধ আছে তা বলা বৈধ। তবে সে বাক্য অবৈধ হলে ভিন্ন কথা।

ঈদের মাসায়েল

১। ঈদের নামাযের জন্য যেমন মহিলারা ঈদগাহে বের হবে, তেমনি শিশুরাও বের হবে। যাতে সকলেই মুসলিমদের নামায ও দুআয় শামিল হতে পারে। ইমাম বুখারী তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে একটি 'বাব' বেঁধে বলেছেন, 'শিশুদের ঈদগাহে বের হওয়ার বাব।' অতঃপর সেখানে ইবনে আব্বাস ﷺ-এর হাদীস সংকলন করেছেন; তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে ঈদুল ফিত্বর অথবা আযহার দিন বের হলাম। সুতরাং তিনি ঈদের নামায পড়লেন অতঃপর খুতবাহ দিলেন। তারপর তিনি মহিলাদের নিকট এসে তাদেরকে নসীহত করলেন, উপদেশ দিলেন এবং সদকাহ করার আদেশ দিলেন। *(বুখারী ৯৭৫নং)* ইবনে আব্বাস সে সময় ছোট ছিলেন।

২। ঈদের খুতবাহ শোনা সুন্নত। জুমআর খুতবার মত তার জন্য বসা ওয়াজেব নয়।

৩। কারো ঈদের নামায ছুটে গেলে কাযা করা বৈধ।

৪। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ উল্লেখ করেছেন যে, ঈদের দুই তকবীরগুলির মাঝে মাঝে আল্লাহর প্রশংসা ও গৌরব বর্ণনা করা, নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পড়া এবং ইচ্ছামত দুআ করা যায়। উলামাগণ এরূপই আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যদি কেউ বলে,

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لله، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَر، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد، وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ۔

'সুবহানাল্লাহ, অল-হামদু লিল্লাহ, অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অল্লাহু আকবার। আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদ, অআলা আ-লি মুহাম্মাদ। আল্লাহুম্মাগফির লী অরহামনী।'

তাহলে তা উত্তম। অনুরূপ যদি বলে,

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْراً، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْراً، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً۔

'আল্লাহু আকবারু কাবীরা, অল-হামদু লিল্লাহি কাষীরা, অসুবহানাল্লাহি বুকরাতাঁউ অআস্বীলা।'

তাও চলবে। *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৪/২১৯)*

ঈদে ইবাদত

মহান আল্লাহ বলেন,

(وَلِكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ) (الحج: ٣٤)

অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করে। *(সূরা হাজ্জ ৩৪ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'মানসাক'-এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, (তা হল) ঈদ। *(ইবনে কাষীর)*

আর এ থেকেই বুঝা যায় যে, ঈদ হল আল্লাহর নৈকট্য লাভ, ইবাদত ও খুশীর মৌসম। আর তা নিম্নলিখিত আচরণের মাধ্যমে

পালিত হবে ঃ-

১। ঈদের নামায আদায়ের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ বলেন,

(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ). (الكوثر:٢)

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর। *(সূরা কাউষার ২ আয়াত)*

২। তকবীর পাঠের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ বলেন,

(وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ). (البقرة:١٨٥)

অর্থাৎ, তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন তার জন্য তোমরা আল্লাহর তকবীর পাঠ (মহিমা বর্ণনা) কর। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত)*

৩। বিশেষ পানাহারের মাধ্যমে। মহানবী ﷺ বলেন, "তাশরীকের দিন হল পানাহার ও আল্লাহর যিক্র করার দিন।" *(মুসলিম ১১৪১)*

৪। যবেহ; আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে কুরবানীর রক্ত বহানোর মাধ্যমে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (٣٦) سورة الحج

অর্থাৎ, আর উঁটকে করেছি আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের অন্যতম; তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান অবস্থায় ওগুলির উপর (নহর করার সময়) তোমরা আল্লাহর নাম নাও। অতঃপর যখন ওরা কাত হয়ে

পড়ে যায় তখন তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও ভিক্ষুক অভাবগ্রস্তকে। এইভাবে আমি ওদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। *(সূরা হাজ্জ ৩৬ আয়াত)*

৫। আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করার মাধ্যমে। যেহেতু এ দিনগুলিতে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ বেশী হয়ে থাকে। আর এ কথা বিদিত যে, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা এক প্রকার ইবাদত ও সওয়াবের কাজ।

৬। ঈদের দিন সাজগোজ করা, খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করাও ইবাদত। যেহেতু তাতে মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের সুন্নত পালন হয়।

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঈদের দিন আল্লাহর রসূল ﷺ আমার নিকট এলেন। সেই সময় আমার কাছে দুটি কিশোরী 'দুফ' [২] বাজিয়ে বুআষ (যুদ্ধের বীরত্বের) গীত গাচ্ছিল। অবশ্য তারা গায়িকা ছিল না। তা দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি কাপড় ঢাকা দিয়ে বিছানায় শুয়ে গেলেন। ইত্যবসরে আবূ বাক্র ﷺ প্রবেশ করলেন এবং আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'শয়তানের সুর আল্লাহর রসূলের কাছে?'

(এ কথা শুনে) আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ চেহারা খুলে আবূ বাক্রের দিকে ঘুরে বললেন, "ওদেরকে ছেড়ে দাও, হে আবূ

---

(2) *ঢপঢপে আওয়াজবিশিষ্ট একমুখো ঢোলক বিশেষ।*

বাক্র। আজ তো ঈদের দিন। প্রত্যেক জাতির ঈদ আছে। আর আজ হল আমাদের ঈদ।” অতঃপর তিনি একটু অন্যমনস্ক হলে আমি তাদেরকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলাম। তখন তারা বেরিয়ে গেল। *(বুখারী ৯৪৯, মুসলিম ৮৯২নং)*

হাফেয ইবনে হাজার বলেন, এই হাদীসের একটি নির্দেশ এই যে, ঈদের দিনগুলিতে পরিবার-পরিজনকে সেই সকল আনন্দের উপকরণ সহজ করার মাধ্যমে প্রশস্ততা প্রদর্শন করা বিধেয়, যার মাধ্যমে তাদের মন-প্রাণ আনন্দিত হয় এবং ইবাদতের কষ্ট থেকে দেহ স্বস্তি, বিরতি ও প্রশান্তি লাভ করতে পারে। তবে (এই শ্রেণীর বাদ্যগীত) থেকে বিরত থাকাই উত্তম। আর এ কথাও জানা যায় যে, ঈদের দিনসমূহে খুশীর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো দ্বীনের অন্যতম প্রতীক। *(ফাতহুল বারী ২/৫১৪ দ্রঃ)*

সুতরাং ভেবে দেখুন, আল্লাহর কত বড় মেহেরবানী যে, আমরা ঈদে আনন্দবোধ করব এবং সেই আনন্দের উপর তিনি আমাদেরকে সওয়াব দান করবেন! কেননা, এই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ দ্বীনের একটি প্রতীক।

কিন্তু জেনে রাখুন যে, এই খুশী ও আনন্দ শরীয়তের গন্ডীতে থেকে হতে হবে। নচেৎ যে কাজে মহান আল্লাহ খোশ নন, তাতে সওয়াবের আশা করাই মহা ভ্রান্তি।

ঈদের এই পবিত্র খুশীতে অবৈধ খেলা ও ফিল্ম্ দর্শন-প্রদর্শন, যুবক-যুবতীর প্রতিযোগিতামূলক খেলা ও অবাধ-ভ্রমণ, ছবি তোলা এবং হারাম গান-বাদ্য ব্যবহার করার মাধ্যমে অবশ্যই বিধেয় খুশীর

বহিঃপ্রকাশ হয় না। আসলে খুশীর নামে তা হয় শয়তানী কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী বিলাস-কর্ম। *(মাজাল্লাতুল বায়ান ১৩৬/২৭)* সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে পানাহ দিন। আমীন।

প্রকাশ থাকে যে, আতশ বা ফটকাবাজি করে খুশী প্রকাশ করা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। যেহেতু এ খেলাতে রয়েছে অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বন, এতে অহেতুক অর্থ অপচয় হয়, এতে আগুন নিয়ে খেলা করা হয় এবং বিপদের আশঙ্কা থাকে অনেক বেশী।

কোন কোন আল্লাহ-ওয়ালা লোক বলেছেন, মানুষ আল্লাহ থেকে গাফেল হয় বলেই গায়রুল্লাহ নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। অতএব গাফেল নিজ খেল-তামাশা ও কুপ্রবৃত্তি নিয়ে আনন্দিত হয়। আর জ্ঞানী নিজ মাওলাকে নিয়ে আনন্দিত হয়।

fl কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, ঈদুল ফিত্বর, নাকি ঈদুল আযহা?

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) উভয় ঈদের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে বলেন, দুটি কারণে ঈদুল ফিত্বর অপেক্ষা ঈদুল আযহা শ্রেষ্ঠতর ঃ-

১। ইদুল আযহার ইবাদত (কুরবানী) ঈদুল ফিত্বরের ইবাদত (ফিত্বরা) অপেক্ষা উত্তম।

২। ঈদুল ফিত্বরের সদকাহ রোযার অনুসারী; যেহেতু তা অসারতা ও অশ্লীলতা থেকে রোযাদারকে পবিত্রকারী এবং গরীব-মিসকীনদের খাদ্য স্বরূপ বিধিবদ্ধ হয়েছে; যা ঈদের নামাযের পূর্বে বের করা সুন্নত। পক্ষান্তরে কুরবানী ঐ দিনেই বিধেয়; যা একটি

পৃথক ইবাদত এবং তা নামাযের পর করতে হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, "সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর।" *(সূরা কাউষার ২ আয়াত)*

গ্রাম-শহরে লোকেদের ঈদের নামায হাজীদের বড় জামরায় পাথর মারার পর্যায়ভুক্ত এবং গ্রাম-শহরে লোকেদের কুরবানী হাজীদের হজ্জের কুরবানী যবেহ করার পর্যায়ভুক্ত। *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৪/২২২)*

ﬂ ঈদের নামায

ঈদের নামায (ওয়াজেব না হলেও) তার প্রতি যত্নবান হন। ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে মুসলিমদের জামাআতে এ নামায আদায় করুন। খবরদার আপনি তাদের মত হবেন না, যাদের মাঝে শয়তান আলস্য ও অবজ্ঞা সৃষ্টি করে দ্বীনের এই মহান প্রতীক আদায়ে বিরত রাখে; ফলে ঘুমিয়ে থেকে ঈদের নামায নষ্ট করে ফেলে।

পক্ষান্তরে কিছু উলামা এবং তাঁদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ঈদের নামায ওয়াজেব হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। দলীল স্বরূপ তাঁরা মহান আল্লাহর এই বাণী পেশ করেন, "সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর।" *(সূরা কাউষার ২ আয়াত)*

অতএব কোন শরয়ী ওযর ছাড়া ঈদের নামায ত্যাগ করা কারো জন্য উচিত নয়। এমনকি মহিলার জন্যও নয়; তারাও ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে মুসলিমদের জামাআতে নামায আদায় করবে।

এমনকি ঋতুমতী ও সদ্য যুবতীরাও ঈদগাহে যাবে। তবে ঋতুমতী নামাযের স্থান থেকে দূরে থাকবে।

fl ঈদের কিছু জরুরী আদব

ঈদুল আযহার দিন এক মহান দিন। যেহেতু এই দিনই হল 'আল-হাজ্জুল আকবার' (বৃহৎ হজ্জের) দিন। ইবনে উমার ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী ﷺ বলেন, "আল-হাজ্জুল আকবার (বৃহৎ হজ্জের) দিন হল কুরবানীর দিন।" *(বুখারী)*

এদিন হল বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে মহান দিন হল কুরবানীর দিন, অতঃপর মিনার অবস্থানের (১১ তারীখের) দিন।" *(আবূ দাঊদ)*

এই মাহাত্ম্যপূর্ণ দিনে যে সকল কাজ করতে যত্নবান হতে হয়, তা নিম্নরূপ ঃ-

fl ঈদগাহে বের হওয়ার সময়

* সকালে গোসল করুন, সাধ্যমত সুন্দর পোশাক পরুন এবং আতর ব্যবহার করুন। ইবনে উমার ﵁ ঈদের জন্য উত্তম পোশাক পরিধান করতেন। যেমন (কুরবানী না থাকলে) গোসলের পূর্বে মোছ, নখ ইত্যাদি কেটে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা উচিত। অবশ্য দাড়ি চাঁছা হারাম।

* এ সময় খাওয়া সুন্নত নয়। নামায পড়ে এসে কুরবানী যবেহ করে তার গোশ্ত্ পাকিয়ে খান। বুরাইদাহ ﵁ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ ঈদুল ফিত্বরের দিন না খেয়ে (ঈদগাহে) বের হতেন না এবং

ঈদুল আযহার দিন নামায না পড়ে খেতেন না। *(তিরমিযী ৪৯৭, ইবনে মাজাহ ১৭৫৬নং)*

* সকাল সকাল আগেভাগে ঈদগাহে বের হন; যাতে ইমামের কাছে জায়গা পেতে এবং নামাযের জন্য অপেক্ষা করার সওয়াব লাভ করতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেন,

(فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) (المائدة: ٤٨)

অর্থাৎ, তোমরা কল্যাণে (সত্বর) প্রতিযোগিতা কর। *(সূরা মাইদাহ ৪৮ আয়াত)*

আর ঈদের দিন এ কাজ একটি কল্যাণ।

* পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যান। আলী বিন আবী তালেব ﵁ বলেন, সুন্নত হল পায়ে হেঁটে ঈদগাহে আসা। *(তিরমিযী ৫৩০নং)*

ইবনুল মুনযির (রঃ) বলেন, পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া উত্তম এবং তা বিনয়ের অতি নিকটবর্তী। অবশ্য সওয়ার হয়ে যাওয়ায় কোন দোষ নেই।

* পথে এবং ঈদগাহে পৌঁছে ইমাম উপস্থিত না হওয়া (বা নামায শুরু না করা) পর্যন্ত তকবীর পড়তে থাকুন। এই তকবীর সকলেই একাকী উচ্চস্বরে পড়বে। অবশ্য মহিলারা পড়বে নিম্নস্বরে।

* যাবার সময় যে পথ ধরে গেছেন, ফিরার সময় সে পথে না ফিরে অন্য পথে বাড়ি ফিরুন।

জাবের ﵁ বলেন, 'ঈদের দিন বের হলে নবী ﷺ রাস্তা পরিবর্তন করতেন।' *(বুখারী ৯৮৬নং)*

তাঁর এই রাস্তা পরিবর্তনের পশ্চাতে ছিল একাধিক যুক্তি ও

হিকমত। যেমন; এর ফলে ইসলামী প্রতীকের সম্যক্ বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। উভয় রাস্তা তাঁর জন্য সাক্ষ্য দেবে। উভয় পথের মুনাফিক বা ইয়াহুদীদেরকে ক্ষুব্ধ করা হবে। উভয় পথের লোকেদেরকে সালাম দেওয়া হবে। উভয় পথের লোকেরা তাঁর সাক্ষাত ও সালামের বর্কত লাভ করবে। অথবা তাদেরকে কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্য অথবা তাদেরকে কিছু দান করার জন্য অথবা সাক্ষাৎ করে নিজ আত্মীয়তার বন্ধন বজায় করার জন্য পথ পরিবর্তন করতেন। *(ফাতহুল বারী ২/৫৪৮, যাদুল মাআদ ১/৪৪৯, মুমতে' ১৭১-১৭২)*

fl যে ঈদ আমরা চাই

ঈদের দিন খুশী ও আনন্দের দিন। তার জন্য; যার হৃদয় নির্মল, যার নিয়ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিশুদ্ধ, যার চিন্তা ও চেতনা অনাবিল, সৃষ্টির সাথে যার চরিত্র বড় সুন্দর।

ঈদের দিন ক্ষমা ও অনুগ্রহের দিন, আপনার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছে তাকে মাফ করা এবং শাস্তির বদলে ক্ষমা প্রদর্শন করার দিন।

ঈদের দিন উপহার-উপঢৌকন বিতরণ করার দিন। বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের নিকট থেকে পুরস্কার লাভ করার দিন।

ঈদের প্রকৃত আনন্দ তার জন্য, যে তার প্রতিপালকের নিবেদিত-প্রাণ অনুগত দাস।

ঈদের আসল খুশী তার জন্য, যে তার প্রতিপালকের প্রতি সত্যনিষ্ঠ, যে তাঁর তসবীহ পড়ে, সর্বদা তাঁকে স্মরণ করে।

ঈদের খুশী তার জন্য নয়, যে নিজের মনের পূজারী, স্বেচ্ছাচারী ও খেয়াল-খুশীর অনুগত।

ঈদের আনন্দ তার জন্য নয়, যে অহংকারী, পরহেযগার-বিদ্বেষী, পরশ্রীকাতর, হিংসুক, পিতামার অবাধ্য, সমাজ-বিরোধী ও দুষ্কৃতী।

ঈদের খুশী তার জন্য নয়, যে নতুন ও দামী পোশাক পরে এবং ভালো ও দামী খাবার খায়; বরং এ খুশী তার জন্য যে গরীবকেও নতুন পরায় এবং ভালো খাওয়ায়।

আমরা সেই ঈদ কামনা করি, যে ঈদের খুশীর হাওয়া মানুষের মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ উড়িয়ে নিয়ে যায়।

আমরা সেই ঈদ কামনা করি, যে ঈদের উল্লাস মানুষের মনে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে।

আমরা সেই ঈদ চাই, যে ঈদের সময় মুসলিম উম্মাহ থাকে উন্নতির উচ্চ শিখরে, হাতে পায় বিশ্বের নেতৃত্ব-ডোর; যেমন ছিল সলফে সালেহীনের যুগে।

আমরা সেই ঈদ কামনা করি, যে ঈদের ঈমানী আনন্দ-বৃষ্টি আমাদের হৃদয়কে সিক্ত করে।

আমরা সেই ঈদ আশা করি, যে ঈদের আনন্দ-বার্তা আমাদের অন্তরকে মহান প্রতিপালকের আনুগত্যে পরিপূর্ণ করে দেয়।

আমরা সেই ঈদ কামনা করি, যে ঈদের খুশী বিতরণ ও বিনিময় হয়। ধনী গরীবের প্রতি সদয় হয়, ফলে সকলেই পায় আনন্দের আস্বাদ।

আমরা সেই ঈদ চাই, যে ঈদের আতর সমাজের মানুষের মনে শান্তি ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

আমরা সেই ঈদ কামনা করি, যে ঈদের সময় মুসলিমরা একে

অপরকে সহযোগিতা করে, সহানুভূতির সাথে বিপদে সান্ত্বনা দেয়। গোটা জাতি থাকে একটি দেহের মত; যার একটি অঙ্গ ব্যথা পেলে সারা দেহ সেই ব্যথা অনুভব করে এবং সারা দেহে জ্বর আসে।

আমরা সেই ঈদ কামনা করি, যে ঈদের সময় মুসলিমরা একে অন্যকে সমাদর করে, বড়কে শ্রদ্ধা ও ছোটকে স্নেহ করে, মানীর মান রক্ষা করে, গুনীর গুণ স্বীকার করে, দলাদলি ও ভেদাভেদ ভুলে সমাজের একতা বজায় রাখে।

আমরা সেই ঈদ কামনা করি, যে ঈদের সময় মুসলিম জাতির বিক্ষত দেহের ক্ষত শুকিয়ে যায়, তার সমস্ত বিপদ-আপদ ও ব্যথা-বেদনার উপশম হয়, তার সকল আশা পূর্ণ হয়, তার শত্রু পরাভূত হোক, তার মাথা উঁচু হোক, তার আওয়াজ শ্রুত হোক এবং তার রায় মান্য হোক।

আমরা সেই ঈদ কামনা করি, যে ঈদের সময় সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং মুসলিমরা তাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে কেবল তাদের প্রতিপালকের বিধান মান্য করে চলে।

তখনই আমরা পাব আসল ঈদের আসল খুশী, আনন্দের প্রকৃত স্বাদ। *(আহকামুল ঈদ, ত্বাইয়ার ১১১পৃঃ)*

'ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক   দোস্ত দুশমন পর ও আপন
সবার মহলে আজি হউক রওনক।
যে আছ দূরে যে আছ কাছে   সবারে আজ মোর সালাম পৌঁছে,
সবারে আজ মোর পরাণ যাচে
সবারে জানাই এ দিল আশক।।' - *নজরুল*

fl ঈদে দাওয়াতী সুযোগ

১। ঈদের উপহারের সাথে ইসলামী ক্যাসেট বা পুস্তিকা যোগ করুন।

২। গ্রিটিং কার্ড গিফট্ করলে তাতে দাওয়াতী কথা ও দুআ লিখুন।

৩। ইন্টারনেট বা মোবাইলের মাধ্যমে ঈদ-মোবারক পাঠালে তাতেও দাওয়াতী বক্তব্য ও উপদেশ প্রেরণ করুন।

fl ঈদে কতিপয় ভুল আচরণ

১। ঈদের দিন আমরা অনেকেই গরীব-নিঃস্বদের কথা ভুলে যাই। ধনীর ছেলেরা নতুন ও দামী পোশাক পরে এবং রকমারি খাবার খেয়ে গরীবের ছেলেদের সামনে আনন্দ প্রকাশ করে বেড়ায়; অথচ তাদের প্রতি কোন সহানুভূতি প্রকাশ করার ইচ্ছা রাখে না।

'তোর পাশের ঘরে গরীব-কাঙাল কাঁদছে যে,
তুই তাকে ফেলে ঈদগাহে যাস্ সঙ সেজে!'

আর আমাদের নবী ﷺ আমাদেরকে বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভায়ের জন্য তাই পছন্দ করেছে যা তা নিজের জন্য করে।" *(বুখারী ১৩নং)*

২। আমাদের অনেকেই পোশাকে ও পানাহারে অতিরঞ্জন করে অপব্যয় করে থাকি। অথচ অপব্যয়কারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন না।

৩। অনেকে ঈদের নামাযকে গুরুত্ব দেয় না। অনেকে খুতবাহ না শুনে এবং তার দুআয় শরীক না হয়ে অপ্রয়োজনে ঈদগাহ ছেড়ে চলে যায় এবং নিজেকে বহু মঙ্গল থেকে বঞ্চিত করে।

৪। ঈদের দিনে আমাদের অনেকেই নিজেদের ছেলেদেরকে ইচ্ছামত খেলনা কিনতে দেয়; ফলে তারা আতশ বা ফটকাবাজির

খেলনা খরিদ করে খুশী প্রকাশ করে। অথচ কোন মুসলিমের জন্য তা বৈধ নয়। যেহেতু এ খেলাতে রয়েছে অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বন, এর শব্দ দ্বারা নিরাপদ মানুষকে সন্ত্রস্ত করে কষ্ট দেওয়া হয়, এতে অহেতুক অর্থ অপচয় হয়, এতে আগুন নিয়ে খেলা করা হয় এবং বিপদের আশঙ্কা থাকে অনেক বেশী।

৫। ঈদগাহে, বাড়িতে, বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, ঈদ-মিলন মেলায় (?) ও পার্কে তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীর অবাধ মিলামিশা ঘটে থাকে; যা ইসলামে বৈধ নয়।

৬। অনেকে ঈদ উপলক্ষ্যে ঘরে অথবা হলে বিশেষ ভিডিও অথবা সিডি ফিল্ম্ দেখে ঈদের আনন্দ উপভোগ করে থাকে! অথচ তা ইসলামী খুশীর দিনে অনৈসলামী কাজ।

৭। অনেকে ঈদের দিন আত্মীয়র কবর যিয়ারত করে থাকে। অথচ তা একটি বিদআত।

তাশরীকের দিনসমূহ

১১, ১২, ১৩ই যুলহজ্জকে ‘আইয়্যামে তাশরীক’ বলা হয়। তাশরীকের অর্থ হল, রৌদ্রে গোশ্ত্ শুকানো। যেহেতু এই দিনগুলিতে কুরবানীর গোশ্ত্ বেশী দিন রাখার জন্য রৌদ্রে শুকানো হত, তাই উক্ত দিনগুলির এই নামকরণ হয়।

এ দিনগুলিও শ্রেষ্ঠ ও ফযীলতপূর্ণ দিনসমূহের অন্যতম; যে মহান কাল-সময়ে আল্লাহ পাক তাঁর যিক্র করতে আদেশ করেছেন। *(বাক্বারাহ ২০৩ আয়াত)*

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, ‘আইয়্যামে মা’লূমাত’ (বিদিত

দিনসমূহ) বলে উদ্দেশ্য হল, (যুলহজ্জের) দশ দিন এবং 'আইয়্যামে মা'দূদাত' (নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনসমূহ) বলে উদ্দেশ্য হল, তাশরীকের (কুরবানী ঈদের পরের তিন) দিনসমূহ। আর এই ব্যাখ্যা অধিকাংশ উলামার। *(ফাতহুল বারী ২/৪৫৮, লাতায়িফুল মাআরিফ ৩২৯পৃঃ)*

fl এ দিনগুলিতে আমাদের করণীয়

তাশরীকের প্রথম দিন (১১ তারীখ)কে আরবীতে 'য়্যাউমুল ক্বার্র' বা অবস্থানের দিন বলা হয়। যেহেতু হাজীগণকে এই দিনে মিনায় অবস্থান করতে হয় এবং তাঁদের জন্য মিনা ছেড়ে প্রস্থান বৈধ নয়।

এই দিন তাশরীকের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। মহানবী ﷺ বলেছেন, (যেমন পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে) "আরাফাহ, কুরবানী ও তাশরীকের দিনসমূহ আহলে ইসলাম, আমাদের ঈদ।" আর "আল্লাহর নিকট সর্বমহান দিন কুরবানীর দিন। অতঃপর (মিনায়) অবস্থানের (ঈদের দ্বিতীয়) দিন।"

গুরুত্বপূর্ণ এই দিনগুলি যাতে অযথা নষ্ট না হয়ে যায়, তার জন্য আমাদের তাতে কিছু করণীয় রয়েছে ঃ-

১। পান-ভোজন, দেখা-সাক্ষাৎ ও আনন্দ করা।

রসূল ﷺ বলেছেন, "তাশরীকের দিনগুলি পান-ভোজনের ও যিক্র করার দিন।" *(মুসলিম ১১৪১নং)*

উপর্যুক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, তাশরীকের দিনগুলিও পান-ভোজনের দিন। আনন্দ ও খুশী করার, আত্মীয়-স্বজনকে সাক্ষাৎ

করার এবং বন্ধু-বান্ধব মিলে ফলপ্রসূ বৈঠক করার দিন। এই দিনগুলিতে অধিকরূপে উত্তম পানাহার; বিশেষ করে মাংস ব্যবহার করা দূষণীয় নয়। তবে তাতে যেন কোন প্রকারের অপচয়, নষ্ট ও আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা না হয়।

২। আল্লাহর যিক্র করা।

তাশরীকের দিনগুলি আল্লাহর যিক্র ও শুক্র করার দিন। যদিও সত্যপক্ষে আল্লাহর যিক্র ও শুক্র করা একজন মুসলিমের জন্য সার্বক্ষণিক কর্তব্য; তবুও বিশেষ করে বর্কতময় এই দিনগুলিতে তাঁর যিক্রে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

তাশরীকের এ তিন দিন কল্যাণময় এই মৌসমের শেষ দিন। হাজীগণ মক্কার মিনায় তাঁদের হজ্জ সম্পাদন করেন এবং অহাজীগণ প্রথম দশকে নানা ইবাদত করে কুরবানীর পশু যবেহ করার মাধ্যমে এ মঙ্গলময় অধ্যায়ের ইতি টানেন। সুতরাং সবশেষে আল্লাহর যিক্রের মাধ্যমে এ মৌসমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হাজী-অহাজী সকলের কর্তব্য।

মহান আল্লাহর একটি বিধান এই যে, তিনি কিছু ইবাদতের শেষে তাঁর যিক্রকে বিধিবদ্ধ করেছেন। যেমন নামাযের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

(فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ)

অর্থাৎ, তারপর যখন তোমরা নামায শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ কর। *(সূরা নিসা ১০৩ আয়াত)*

আর জুমআর নামাযের ব্যাপারে বলেন,

(فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الجمعة: ١٠)

অর্থাৎ, অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও। *(সূরা জুমআহ ১০ আয়াত)*

হজ্জের ব্যাপারে বলেন,

(فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً)

অর্থাৎ, অতঃপর যখন তোমরা (হজ্জের) যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে নেবে, তখন (মিনায়) আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন (জাহেলী যুগে) তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করতে, অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে। *(সূরা বাক্বারাহ ২০০ আয়াত)*

বর্কতময় এই দিনগুলিতে মহান আল্লাহর যিক্র বিভিন্নরূপে হয়ে থাকে ঃ-

১। হাজী ও অহাজীদের নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট সকল প্রকার তকবীর পাঠ করে তাঁর যিক্র হয়ে থাকে। ইবনে উমার ﵁ এই দিনগুলিতে মিনায় তকবীর পাঠ করতেন; তকবীর পাঠ করতেন প্রত্যেক নামাযের পরে। নিজের বিছানায়, তাঁবুতে, মজলিসে এবং চলার পথেও তকবীর পাঠ করতেন।

মাইমূনা (রাঃ) কুরবানীর দিন তকবীর পড়তেন। মহিলারা আবান বিন আফ্ফান ও উমার বিন আব্দুল আযীযের পিছনে তাশরীকের

রাতগুলিতে পুরুষদের সাথে মসজিদে (নামায পড়তে গিয়ে) তকবীর পাঠ করত। *(ফাতহুল বারী ২/৫৩৪)*

বলাই বাহুল্য যে, বাজারে, ঘরে, মসজিদে ও পথে আল্লাহর তা'যীম প্রকাশ ও তাঁর দ্বীনের প্রতীক প্রতিষ্ঠার জন্য এ তকবীর পাঠ করা বিধেয়।

২। কুরবানী যবেহ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' ও 'তাকবীর' পড়েও তাঁর যিক্র করা হয়।

৩। পানাহারের আগে-পরে নির্দিষ্ট দুআ বলেও তাঁর যিকর করা হয়ে থাকে। যখন এ কথা অবধারিত যে, এ দিনগুলি অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশী খাওয়া ও পান করার দিন, তখন নিশ্চয়ই তার আগে-পরে আল্লাহর যিক্রও বেশী হবে। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন যে, বান্দা খাবার খেলে তার উপর সে (আল-হামদু লিল্লাহ বলে) তাঁর প্রশংসা করবে এবং পানীয় পান করলে সে তাঁর প্রশংসা করবে।" *(মুসলিম ২৭৩৪নং)*

fl এ দিনগুলি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

১। তাশরীকের শেষ দিন (১৩ তারীখ) পর্যন্ত কুরবানী যবেহ করা বৈধ।

২। এ দিনগুলিতে নফল রোযা রাখা বৈধ নয়, যেহেতু এগুলি হল ঈদের দিন।

fl এ দিনগুলিতে আচরিত কিছু ভুল

১। পানাহারে অপচয় করা, বিশেষ করে গোশ্ত্ খাওয়াতে

অতিরঞ্জন করা এবং অতিভোজনে পেট নষ্ট করা।

২। আত্মীয়-স্বজনের সাথে অসার গল্পে লম্বা সময় ধরে রাত্রি জাগরণ করা।

৩। পার্ক, সমুদ্র-সৈকত, নদীর ধার, বন-বনানী প্রভৃতি জায়গায় বেড়াতে যাওয়া এবং আল্লাহর যিক্র ভুলে যাওয়া।

৪। ইন্টারনেট বা টিভির সামনে অযথা সময় নষ্ট করা।

পরিশেষে বলি যে, এই দিনগুলির গুরুত্ব স্মরণ করে আমাদের উচিত, বেশী বেশী যিক্র ও তকবীর পড়া এবং কেবল আনন্দ প্রকাশ ও পানাহারে মত্ত না থাকা। সেই বান্দা কতই না আল্লাহভক্ত, যে সর্বদা আল্লাহর যিক্র করতে থাকে; এমনকি পানাহার, ভ্রমণ ও আনন্দের সময়ও তা বিস্মৃত হয় না।

বলাই বাহুল্য যে, এ দিনগুলিতে পান-ভোজনের মাধ্যমে মুসলিমের শরীর পুষ্ট হয়; তেমনি মহান আল্লাহর যিক্র ও শুক্রের মাধ্যমে পরিপুষ্ট হয় তার হৃদয়। আর এইভাবে উভয় নিয়ামত লাভে সক্ষম হয় আল্লাহ-ওয়ালা মানুষ। লাভ করে নেয়ামতের উপর নিয়ামত। একটি নিয়ামতের শুক্র আদায় করলে, ঐ শুক্রই হয় দ্বিতীয় নিয়ামত। সুতরাং তখন দরকার পরে আর এক শুক্রের এবং তাও এক নিয়ামত। আর এইভাবে শুক্রের পর শুক্রের কোন শেষ নেই মুমিন বান্দার কাছে।

১৩ যুল-হজ্জের পর কি?

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মুসলিমরা যুল-হজ্জের ১৩টি দিন অতিবাহিত করল। তাদের মধ্যে অনেকেই সে দিনগুলিকে আল্লাহর আনুগত্য, ইবাদত, নেক আমল, যিক্র, তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ও নামায দ্বারা আবাদ করল এবং কুরবানী যবেহ করে তার গোশ্ত্ দান করার মাধ্যমেও তাঁর নৈকট্য লাভ করল। তাদের চেহারায় খুশীর ছবি প্রতিভাত হল, জীবন আলোকিত হল ঈমান ও যিক্রের আলোকে। বৃদ্ধি করল আপোসের সম্প্রীতি; মুবারকবাদ বিনিময়, পানভোজন ও দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে।

পক্ষান্তরে হাজীগণ দ্বীনের একটি রুক্ন আদায় করলেন। মক্কার পথে ও হজ্জ পালনে কত রকমের কষ্ট স্বীকার করলেন এবং তাতে ধৈর্য ধারণ করলেন। অতঃপর সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় নিজ নিজ বাড়ি ফিরে এলেন।

সুতরাং মুবারকবাদ তাদের জন্য, যারা এই 'বর্কতময় দিনগুলি'কে কাজে লাগিয়ে উপকৃত হতে পেরেছে। যারা তার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব জেনে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে।

আর কত মিসকীন ও নিঃস্ব সে ব্যক্তি, যার অবহেলার মাঝে এ দিনগুলি সাধারণ দিনের মতই অতিবাহিত হয়ে গেল এবং তার দ্বারা কোন প্রকারের উপকৃত হতে পারল না।

বরং কিছু লোক তো এমনও রয়েছে যে, যাদের পাপাচরণ এ

দিনগুলিতে আরো বৃদ্ধি পায়। যেহেতু তা হয় ছুটি ও খুশীর দিন। ফলে তারা অবসর পেয়ে রাত্রি জেগে অবৈধ জিনিস দর্শন করে এবং অনেক সময় ফজরের নামায ছেড়ে দিন পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে। আবার কেউ তো বের হয় অবৈধ সফরে!

এমন লোক জানে না যে, সে এ দিনগুলিকে পুনরায় আগামী বছরে ফিরে পাবে কি না। সে জানে না যে, হয়তো বা তার আগেই মৃত্যু তাকে মরণ-সাগর-তীরে পৌঁছে দেবে। আর তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যাবে এবং শুরু হবে হিসাব-নিকাশ।

ভেবে দেখুন, যারা গত বছর আমাদের সাথে ঈদের নামায পড়েছিল এবং আনন্দে শরীক ছিল, 'বর্কতময় দিনগুলি'তে আল্লাহর ইবাদত করেছিল, আজ তারা কোথায়? অনেকের পিতা, মাতা, দাদা, দাদী, নানা অথবা নানী, অমুক রাজা, অমুক মুহাদ্দিস, অমুক অমুক লোক, যারা গত বছরে ছিল, এ বছরে তারা কোথায় গেল? আপনি কি জানেন যে, আপনিও হয়তো আগামী বছরে সেথায় চলে যাবেন, যেথায় ওরা চলে গেছে?

'যুবক বৃদ্ধ শিশু ও বালক কিশোর-কিশোরী দল,
জ্ঞানী-বিজ্ঞানী দর্শনবিদ্ ভেসে চলে অবিরল।'
'--সংসার ছেড়ে চলে যায় ঐ মরণ আহত যাত্রি রে,
সান্ত্বনা তুই কি দিবি তারে সম্মুখে তিমির রাত্রি রে।'

পক্ষান্তরে যে ভাই এ দিনসমূহ দ্বারা উপকৃত হয়েছে, এ বর্কতময় দিনগুলিতে নেক আমল করে পথের যথেষ্ট সম্বল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে, তারও জেনে রাখা উচিত যে, সে সকল দিন পার হয়ে

গেল, তা বলে মুমিনের আমল বন্ধ হয়ে যাবে না। সেই নফল নামায, রোযা, যিক্র, উমরাহ, সদকাহ প্রভৃতি নেক আমল সারা বছরেই বিদ্যমান থাকবে।

সুতরাং আল্লাহ আপনাকে নেক আমলের অধিক তওফীক দিন - আপনি আপনার সাধ্যমত অবিরত নেক আমল করে যান। তাতেও রয়েছে নেকী ও সওয়াব। আর কোন ইবাদতের মৌসম শেষ হলেই প্রকৃত মুমিনের ইবাদত শেষ হয়ে যায় না। বরং তার জীবন-মরণ তো আল্লাহর জন্যই। অতএব মরণ অবধি তার আমল বন্ধ হতে পারে না। আর মহান প্রতিপালকের আদেশ হল,

(وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) (الحجر : ٩٩)

অর্থাৎ, তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। *(সূরা হিজ্র ৯৯ আয়াত)*

(وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً) (مريم : ٣١)

অর্থাৎ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আজীবন নামায ও যাকাত আদায় করতে। *(সূরা মারয়্যাম ৩১ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, আল্লাহর ইবাদত কোন মৌসম দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। বরং দেহে প্রাণ ও মস্তিষ্কে জ্ঞান থাকতে তা প্রত্যেক মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য।

আর ভুলে ভুলে যার সময় পার হয়ে গেছে এবং এখনো সুমতি লাভের তওফীক পায়নি, তার সামনে সকল দরজা বন্ধ নয়, সম্মুখের পথ রুদ্ধ নয়। বরং তওবার দরজা খোলা আছে, আর

মহান প্রভুর মহা অনুগ্রহ অহরহ বিতরণ হয়েই চলেছে।

যারা প্রভুর ইবাদতে ত্রুটি ও অবহেলা করে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা ইবাদত করবে সেই মহান প্রতিপালকের, যিনি পরম দয়াবান, যাঁর দয়া প্রত্যেক বস্তুর উপর পরিব্যাপ্ত। তিনি চরম ক্ষমাশীল, মহা অনুগ্রহশীল, মহানুভব।

আমল করে যান সেই মহান প্রভুর উদ্দেশ্যে। সঠিকভাবে আমল করুন এবং চেষ্টা রাখুন, যাতে তা তাঁর নিকট গৃহীত হয়। আমাদের সলফগণ যে কাজই করতেন, তা পরিপূর্ণরূপে, যথার্থরূপে নিপুণতার সাথে করতেন, অতঃপর তা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ও গ্রহণযোগ্য হোক তার খেয়াল রাখতেন। আশঙ্কা করতেন, হয়তো বা তা মালিকের কাছে বর্জিত বা প্রত্যাখ্যাত হবে। এমন লোকেদের ভয়ের কথাই মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ }

অর্থাৎ, তাদের যা দান করবার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে। *(সূরা মু’মিনূন ৬০ আয়াত)*

আর নেক আমলের পর পুনরায় নেক আমল করে যাওয়া তা কবুল হওয়ার একটি নিদর্শন। যেমন নেক আমলের পর কোন বদ আমল করা তা রদ্দ হওয়ার একটি নিদর্শন।

আল্লাহভক্ত মুমিন এক মঙ্গল থেকে অন্য মঙ্গলে স্থানান্তরিত হয়, এক মৌসম থেকে অন্য মৌসমে এসে অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ লাভ করে, মহান প্রভুর করুণা ও সন্তুষ্টি অর্জন করে ধন্য হয়। তাছাড়া আজব কথা এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ বিতরণের

জন্য অসংখ্য বড় বড় আমল আমাদেরকে দান করেছেন; বহু উপায়-উপকরণ দিয়েছেন, যা অতি সহজ ও সামান্য। তাতে কোন কষ্ট স্বীকার করতে হয় না, তাতে বিরক্তি আসে না ও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। তাতে পরিবার-পরিজন ও ঘর-সংসার ছেড়ে বাইরে যেতে হয় না, তার জন্য স্বদেশ ত্যাগও করতে হয় না, অর্থও ব্যয় করতে হয় না। বরং তা একেবারেই সহজসাধ্য ও হাল্কা কাজ; তা হল আল্লাহর যিক্র, তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ ও তাকবীর।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দিনে ১০০বার 'সুবহা-নাল্লা-হি অ বিহামদিহ' পাঠ করে সেই ব্যক্তির পাপরাশি সমুদ্রের ফেনার মত হলেও মাফ হয়ে যায়।" *(বুখারী ৬৪০৫, মুসলিম ২৬৯১নং)*

একদা আল্লাহর নবী ﷺ আবূ হুরাইরা ؓ-এর পাশ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিলেন; তখন তিনি গাছ লাগাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আবূ হুরাইরা! তুমি কোন্ গাছ লাগাচ্ছ?" আবূ হুরাইরা বললেন, আমার এক গাছ লাগাচ্ছি। নবী ﷺ বললেন, "আমি কি তোমাকে এর চাইতে উত্তম গাছের কথা বলে দেব না?" আবূ হুরাইরা বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, "সুবহানাল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, আল্লা-হু আকবার' এগুলির প্রত্যেকটির বিনিময়ে বেহেশ্তে তোমার জন্য এক-একটি গাছ লাগানো হবে।" *(ইবনে মাজাহ ৩৮০৭নং)*

সুসমাপ্তি

এই পুস্তিকায় 'বর্কতময় দিনগুলি'তে যে সকল নেক আমলের গুরুত্বের কথা আলোচনা করা হয়েছে - দুঃখের বিষয় যে, বহু লোকেই তার যথার্থ কদর করে না। ঐ আমলের গুরুত্ব অনেকের মনে স্থান পায় না। অথচ তার এত বড় মাহাত্ম্য রয়েছে যে, অন্য দিনে আল্লাহর পথে জিহাদও তার মত নয়। তবে এমন কোন ব্যক্তি (এর আমল) যে নিজের জান-মাল সহ বের হয় এবং তারপর কিছুও সঙ্গে নিয়ে আর ফিরে আসে না; যেমন এ কথা হাদীসে স্পষ্টভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, এই 'বর্কতময় দিনগুলি'র জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া, তওবা ও অনুশোচনার সাথে তা বরণ করা, তার গুরুত্ব হৃদয়-মনে ঠিক সেইরূপ স্বীকার করা যেরূপ মহান আল্লাহ তার প্রতি আরোপ করেছেন। মুসলিমের উচিত, বিভিন্ন নেক আমলের মাধ্যমে এই দিনগুলিকে আবাদ করা, কল্যাণের দিকে ধাবিত হয়ে প্রতিযোগিতা করা। কতই না সুন্দর হয়, যদি আমরা এই দিনগুলির সদ্ব্যবহার করে হিজরী সনের সুসমাপ্তি ঘটাতে পারি। সম্ভবতঃ তার ফলে গত বছরের আমাদের

গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে।

পরিশেষে আমরা পাঠকের কাছে আশা করব যে, এই পুস্তিকা পড়ার পর যেন আমাদের জন্য অদৃশ্যে থেকে দুআ করতে না ভুলেন। যেমন যদি তাতে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে থাকে, তাহলে তা আমাদেরকে অবহিত করে বাধিত করবেন।

نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، وأن يجعلنا من عباده الصالحين إنه سميع مجيب ٠

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

fl fl fl fl
fl fl fl
fl fl
fl